প্যাভিলিয়ন
সুইচহিট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০১৬ সংখ্যা
T20
ICC
WORLD
TWENTY20
INDIA 2016

এই তো, রোমাঞ্চ শেষ হয়েছে এক বছরও হয়নি। দেখতে দেখতে আবারও বিশ্বকাপ চলে এলো! এবার ৫০ ওভারের নয়, রঙ্গমঞ্চটা ২০ ওভারের। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণের উন্মাদনা যেখানে সবচেয়ে বেশি, প্রথমবারের মতো সেই ভারতে হচ্ছে "ছোট বিশ্বকাপ"। সামনের কয়েকটা দিন তাই চার-ছক্কার ফুলঝুরি দেখেই কাটবে, নিশ্চিতভাবেই দুলবে রোমাঞ্চ-স্নায়ুচাপের নাগরদোলায়। ফ্রি-হিটে মত্ত হবে সবাই, থাকবে 'সুপার ওভার' এর হাতছানি! মাশরাফিদের সঙ্গে টি-টোয়েন্টির রথী-মহারথীরা থাকবেন তাই আলোচনায়, চায়ের কাপে, নিতান্ত আড্ডায়! টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপ উন্মাদনাকে ধরে রাখারই প্রয়াস প্যাভিলিয়নের সুইচ হিট।

প্যাভিলিয়ন সুইচ-হিট

সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ্ বিন আনোয়ার

সম্পাদনা সমন্বয়কারী
প্রিয়ম মজুমদার

গ্রাফিক্স
কনক সাহা

প্যাভিলিয়ন ওয়েবসাইটঃ www.pavilion.com.bd

ই-মেইলঃ info@pavilion.com.bd

সুইচহিট

অতৃপ্তির তৃপ্তিটা কই?	৪
তবুও আশার ভেলা	৭
বেলাশেষে	১০
ওই নতুনের কেতন ওড়ে	১২
জয়তু টি টোয়েন্টি	১৪
স্মৃতির আয়নায় টি টোয়েন্টি	১৫
ক্রিকেট কাঁপানো সেই ফাইনাল	১৭
হতাশার নাম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	১৯
ধর্মশালায় ক্রিকেটধর্ম	২১
ছবি কথা কয়	২৩
অস্ট্রেলিয়ার যে ছবিটা নেই	২৭

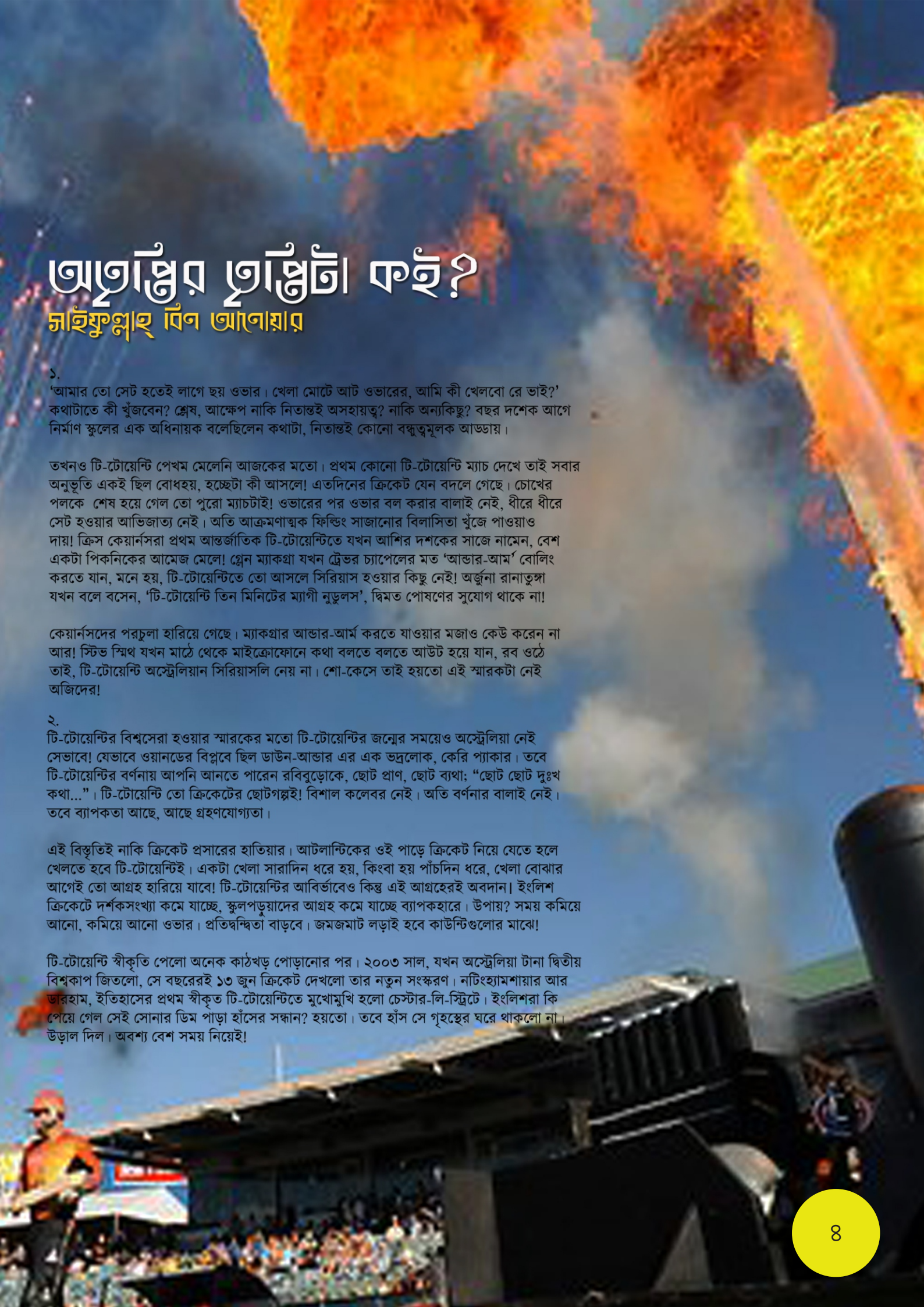

অতৃপ্তির তৃপ্তিটা কই?

সাইফুল্লাহ বিন আনোয়ার

১.
'আমার তো সেট হতেই লাগে ছয় ওভার। খেলা মোটে আট ওভারের, আমি কী খেলবো রে ভাই?' কথাটাতে কী খুঁজবেন? শ্লেষ, আক্ষেপ নাকি নিতান্তই অসহায়ত্ব? নাকি অন্যকিছু? বছর দশেক আগে নির্মাণ স্কুলের এক অধিনায়ক বলেছিলেন কথাটা, নিতান্তই কোনো বন্ধুত্বমূলক আড্ডায়।

তখনও টি-টোয়েন্টি পেখম মেলেনি আজকের মতো। প্রথম কোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দেখে তাই সবার অনুভূতি একই ছিল বোধহয়, হচ্ছেটা কী আসলে! এতদিনের ক্রিকেট যেন বদলে গেছে। চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল তো পুরো ম্যাচটাই! ওভারের পর ওভার বল করার বালাই নেই, ধীরে ধীরে সেট হওয়ার আভিজাত্য নেই। অতি আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজানোর বিলাসিতা খুঁজে পাওয়াও দায়! ক্রিস কেয়ার্নসরা প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যখন আশির দশকের সাজে নামেন, বেশ একটা পিকনিকের আমেজ মেলে! গ্লেন ম্যাকগ্রা যখন ট্রেভর চ্যাপেলের মত 'আন্ডার-আর্ম' বোলিং করতে যান, মনে হয়, টি-টোয়েন্টিতে তো আসলে সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই! অর্জুনা রানাতুঙ্গা যখন বলে বসেন, 'টি-টোয়েন্টি তিন মিনিটের ম্যাগী নুডুলস', দ্বিমত পোষণের সুযোগ থাকে না!

কেয়ার্নসদের পরচুলা হারিয়ে গেছে। ম্যাকগ্রার আন্ডার-আর্ম করতে যাওয়ার মজাও কেউ করেন না আর! স্টিভ স্মিথ যখন মাঠে থেকে মাইক্রোফোনে কথা বলতে বলতে আউট হয়ে যান, রব ওঠে তাই, টি-টোয়েন্টি অস্ট্রেলিয়ান সিরিয়াসলি নেয় না। শো-কেসে তাই হয়তো এই স্মারকটা নেই অজিদের!

২.
টি-টোয়েন্টির বিশ্বসেরা হওয়ার স্মারকের মতো টি-টোয়েন্টির জন্মের সময়েও অস্ট্রেলিয়া নেই সেভাবে! যেভাবে ওয়ানডের বিপ্লবে ছিল ডাউন-আন্ডার এর এক ভদ্রলোক, কেরি প্যাকার। তবে টি-টোয়েন্টির বর্ণনায় আপনি আনতে পারেন রবিবুড়োকে, ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা; "ছোট ছোট দুঃখ কথা..."। টি-টোয়েন্টি তো ক্রিকেটের ছোটগল্পই! বিশাল কলেবর নেই। অতি বর্ণনার বালাই নেই। তবে ব্যাপকতা আছে, আছে গ্রহণযোগ্যতা।

এই বিস্তৃতিই নাকি ক্রিকেট প্রসারের হাতিয়ার। আটলান্টিকের ওই পাড়ে ক্রিকেট নিয়ে যেতে হলে খেলতে হবে টি-টোয়েন্টিই। একটা খেলা সারাদিন ধরে হয়, কিংবা হয় পাঁচদিন ধরে, খেলা বোঝার আগেই তো আগ্রহ হারিয়ে যাবে! টি-টোয়েন্টির আবির্ভাবেও কিন্তু এই আগ্রহেরই অবদান। ইংলিশ ক্রিকেটে দর্শকসংখ্যা কমে যাচ্ছে, স্কুলপড়ুয়াদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে ব্যাপকহারে। উপায়? সময় কমিয়ে আনো, কমিয়ে আনো ওভার। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। জমজমাট লড়াই হবে কাউন্টিগুলোর মাঝে!

টি-টোয়েন্টি স্বীকৃতি পেলো অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর। ২০০৩ সাল, যখন অস্ট্রেলিয়া টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতলো, সে বছরেরই ১৩ জুন ক্রিকেট দেখলো তার নতুন সংস্করণ। নটিংহ্যামশায়ার আর ডারহাম, ইতিহাসের প্রথম স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হলো চেস্টার-লি-স্ট্রিটে। ইংলিশরা কি পেয়ে গেল সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের সন্ধান? হয়তো। তবে হাঁস সে গৃহস্থের ঘরে থাকলো না। উড়াল দিল। অবশ্য বেশ সময় নিয়েই!

৩.
ক্যারিবীয় বিশ্বকাপটা 'ফ্লপ' হয়েছিল মূলত লম্বা সময়ের কারণেই। প্রায় ৪৭ দিন ধরে চলা সে বিশ্বকাপে আবার ছিল না বাদ্যযন্ত্রের প্রবেশাধিকার। মদ নিষিদ্ধ, পতাকা-ব্যানার নেয়া যাবে না, এমনকি নিজের বোতলে পানিও না! চির-আমুদে ক্যারিবীয়রা মুখ ফিরিয়ে নিল। আইসিসির মাথাখারাপ অবস্থা, দিনের শেষে ক্রিকেট নামক পণ্যটাই তো বেচতে হবে! দৃশ্যপটে আবির্ভাব তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। কিন্তু সদস্য দেশগুলোকে বোঝাবে কে?

বিসিসিআই মহাসচিব নিরঞ্জন শাহ বললেন,টি-টোয়েন্টি? তাহলে টেন-টেন বা ফাইভ-ফাইভ অথবা ওয়ান-ওয়ানই বা নয় কেন?' স্রেফ জানিয়ে দিলেন, 'ভারত কোনোদিন টি-টোয়েন্টি খেলবে না'। হাসি পাচ্ছে? পেতেই পারে। নিরঞ্জন এক শর্তে এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনে রাজি হয়েছিলেন, অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যাবে না। আইসিসি সভাপতি এহসান মানি রীতিমতো রাজনীতির আশ্রয় নিলেন। ২০১১ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ দেয়ার বিনিময়ে নিরঞ্জনকে রাজি করালেন প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের দল পাঠানোয়। ভারতও কম না। শচীন, সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষণদের ছাড়াই পাঠালো দল। অধিনায়ক মাহেন্দ্র সিং ধোনি। বিশ্বকাপের আগে ভারত খেলেছিল মোটে একটি টি-টোয়েন্টি; ভারত বা পাকিস্তানের কেউ প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেনি কোনো! তারপর?

মিসবাহর ডেথস্কুপ ভারতকে ভাসালো উল্লাসে। বিশ্বকাপ দেখতে দেখতেই ললিত মোদি আইপিএলের প্রস্তাবনা অনুমোদন করিয়ে নিলেন, চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টির ভাবনাও নিয়ে এলেন। এহসান মানি আজ আইসিসিতে নেই, নিরঞ্জন শাহ বিসিসিআইতে নেই, মোদি আইপিএলের হারানো সিংহাসন খুঁজে ফিরছেন শুধু! তবে টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপ আছে, আইপিএল আছে। বহাল তবিয়তে। মেলছে পেখম, উড়ছেই তো!

৪.
মুসা আমানও উড়াতে পারতেন। বিমান। তিন গোয়েন্দা পড়ে থাকলে মুসাকে চেনার কথা। চেনার কথা কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ডকেও। অতি বুদ্ধিমান, অতি সাহসী কেউ, কেউ আবার বইয়ের পোকা। কেউ ইলেকট্রনিক্সে পারদর্শী, কেউবা আবার কারাতেতে ভাল! আধুনিক ক্রিকেটারদের অনেককেই কিন্তু একের ভিতরই তিন হতে হয়! একাই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান, একাই আমেরিকান নিগ্রো, একাই আইরিশ আমেরিকান! ডেভিন ওয়ার্নাররা তাই টেস্ট খেলেন, ওয়ানডে খেলেন, টি-টোয়েন্টিও খেলেন!

শুরুতে টেস্ট ছিল। ওয়ানডে এলো আশির দশকে। কেরি প্যাকার বিপ্লব ঘটিয়ে ওয়ানডের আধুনিকায়ন করলেন। টি-টোয়েন্টি এলো। জিটিভির মালিক ভারতীয় বোর্ডের ব্রডকাস্টিং স্বত্ব না পেয়ে হতে চাইলেন এ শতাব্দীর কেরি প্যাকার। নিয়ে এলেন আইসিএল। কপিল দেবকে ভারতীয় বোর্ডের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। কপিল আইসিএল দিয়ে 'একশজন শচীন' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখালেন! আইপিএলের ডামাডোলে হারিয়ে গেল তা! শাহরিয়ার নাফিসদের কেউ কেউ ফিরে এলেন। তবে হারিয়ে গেলেন আফতাবরা।

দুনিয়াজোড়া শুরু হলো সুপার-ডুপার সব প্রিমিয়ার লিগ। ক্রিকেটার কেনাবেচা শুরু হলো। ক্রিস গেইলরা হয়ে যেতে লাগলেন ফ্রি-ল্যান্সার। যে টাকা দিবে, খেলবেন তার হয়ে। ললিত মোদির আইপিএলে হারিয়ে গেলেন অ্যালান স্ট্যানফোর্ডের মতো ব্যবসায়ীও, যিনি আইসিসিকে প্রথম মিলিয়ন ডলারের লোভ দেখিয়েছিলেন!

বিসিবিই বা বসে থাকে কেন! তারা আনলো বিপিএল। বিসিবি জানতো না, কিংবা বুঝতো না, এই প্রিমিয়ার লীগের সঙ্গে তাঁরা আনছেন ফিক্সিংয়ের এক বিষবাষ্পও! এবার হারিয়ে গেলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। টি-টোয়েন্টির সবই বোধহয় 'বেশ তো, ভাল তো'-র মতো। খারাপের মধ্যে খারাপ শুধু আশরাফুল-আফতাবদেরই হারিয়ে ফেলা!

৫.
টি-টোয়েন্টিতে হারিয়ে যাচ্ছে আরও অনেক কিছুই। স্পিনাররা বল ঘুরাতে চান না। ফ্লাইট বেশী দেয়ার দরকার নেই। দিলেই তো ঝুঁকি বাড়বে! অথচ হওয়ার কথা উল্টো। ফ্লাইট দিলে ব্যাটসম্যান শট খেলবে, আউটের ঝুঁকি বাড়বে! কিন্তু ব্যাটসম্যানকে আউট করেই বা কী লাভ! ২০ ওভার, ১১ জন ব্যাটসম্যান। তার চেয়ে বরং রান আটকানোই শ্রেয়! অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে, ওয়াইডের দাগঘেঁষা ফুল লেংথের ডেলিভারিটাই তাই অসাধারণ! টি-টোয়েন্টির মতো করে ওয়ানডের ডেথ-ওভারেও তা দারুণ বল। ওয়ানডেকে যে বোলারদের জন্যই ডেড বানিয়ে ফেলা হচ্ছে! ব্যাটের সাইজ বাড়ে, মাঠ ছোট হয়ে আসে। ফ্রি-হিট আসে। বোলাররা কোণঠাসা হন। কোনো পেসারকে টি-টোয়েন্টিতে বোলিং করতে দেখে তাই ইমরান খানের মনে হয়, ভিনগ্রহ থেকে কোনো প্রাণী এসেছেন!

তবে টি-টোয়েন্টি শুধু কেড়ে নেয়নি, বা নিচ্ছে না। ফিল্ডিংয়ের উন্নতিটা চোখে পড়ার মতো এখন। ব্যাটসম্যানদের উদ্ভাবনী শট বেড়েই চলেছে। রিভার্স স্কুপ থেকে শুরু করে পেটেন্ট করা দিলস্কুপ শট খেলছেন তাঁরা।

টি-টোয়েন্টির দ্রুত রান তোলার মানসিকতা গিয়ে ঠেকছে টেস্ট পর্যন্ত! আগে চতুর্থ ইনিংসে যে রান তাড়া করতে গিয়ে আগেই ড্র-এর মানসিকতা নিয়ে নামতো সবাই, এখন নামে জিততে। অতি সাহসী না হলে তাই আগেভাগেই ইনিংস ঘোষণা করার সাহস দেখান না অনেক অধিনায়কই!

আর হ্যাঁ, ক্রিকেটাররা টাকা পাচ্ছেন। মাথা ঘুরে ওঠার মতো টাকার সেই অঙ্কটা। এদেশ থেকে ওইদেশ ঘুরে বেড়িয়ে ক্রিকেট ফেরি করেন তাঁরা। টি-টোয়েন্টি না হলে কি মার্কিন মুলুকের বেসবল গ্রাউন্ডে ক্রিকেট হয়! ফিরে আসেন শৈশব কৈশোরের তারকারা!

৬.
শৈশব কৈশোরের তারকারা না হয় আবার খেলতে ফিরে আসেন, কিন্তু এখন যাঁদের শৈশব কৈশোর, যাঁরা হবেন ভবিষ্যতের তারকা, কী অবস্থা তাঁদের? রাহুল দ্রাবিড় ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ আর 'এ' দলকে কোচিং করিয়েছেন সম্প্রতি। তিনি দেখেছেন তাঁদের কিছু রূপ। তাঁরা মেধাবি, সন্দেহ নেই। তবে ফিল্ডাররা যখন ছড়িয়ে পড়ে, ব্যাটসম্যানরা দিশা পান না, সিঙ্গেলস কিভাবে বের করবেন! বোলারদের উইকেট পাওয়ার সব কৌশল যেন শেষ হয়ে যায়, যখন ব্যাটসম্যানরা আক্রমণ করা বন্ধ করে দেন! হয়তো তাঁরা টি-টোয়েন্টির যুগে বেড়ে উঠেছে বলেই!

টি-টোয়েন্টি ফিল্ডিংয়ের উন্নতি করেছে, তবে রাহুল দ্রাবিড় চলে যাবার পর থেকে ভারতের স্লিপ-কর্ডনটা যেন আলগাই হচ্ছে! ইউনুস খান থাকতে তবুও পাকিস্তানের একটু জোর ছিল। মাহেলা জয়াবর্ধনে থাকতে রঙ্গনা হেরাথ চিন্তা করতেন না বোধহয় খুব একটা! অ্যালেস্টার কুকের আশপাশ থেকেও গ্রায়েম সোয়ান, অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসরা হারিয়ে গেছেন! যারা টি-টোয়েন্টি প্রজন্ম, তারা তো ঘন্টার পর ঘন্টা একটা ক্যাচের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন না।পার্টনারশিপ ক্যাচ নিতে তারা পটু, তবে স্লিপ থেকে ঠিকই হাত গলে বেরিয়ে যায় ক্যাচ!

আবেগ নামের ওই আশ্চর্য জিনিসটা কিন্তু ঠিকই থাকে! বাংলাদেশে। টি-টোয়েন্টি হোক বা ওয়ানডে, বাংলাদেশের খেলার দিন রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়, এখানে ওখানে কোনো টেলিভিশন সেটের সামনে জটলা। কেউবা লাউডস্পিকারে বাজাচ্ছেন সরাসরি ধারাভাষ্য! তবে এই আবেগের মূল শর্ত হলো সাফল্য! কান্না তখনই আসে, সাফল্য যখন হাতছানি দিয়ে ছুঁয়ে যায়! ভারত-পাকিস্তানের এক টি-টোয়েন্টি ফাইনাল বদলে দিল কতকিছু! টি-টোয়েন্টি খেলতেও যেমন ক্রিকেটারদের বদলাতে হয়। হাশিম আমলা বা মাহেলা জয়াবর্ধনেদের অবশ্য লাগে না তা। জয়াবর্ধনে তাই কোনো রকম উদ্ভাবনী শট না খেলেই সেঞ্চুরি পেয়ে যান। আমলার ব্যাটিং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় টি-টোয়েন্টিতেও! বিশ ওভারের এই ফরম্যাট বরং ইংল্যান্ডকে অধরা একটা বৈশ্বিক ট্রফি দেয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যালিপসো সুরে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে চায়।সাঙ্গা-জয়ার একটা ট্রফির আক্ষেপ ঘুচিয়ে দেয়!

৭.
আবুধাবিতে সিরিজের প্রথম টেস্ট। নিষ্প্রাণ এক ড্র এর দিকেই এগুচ্ছিল ম্যাচটা। আগের ইনিংসে অভিষেকে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড গড়া আদিল রশীদই পরের ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফিরিয়ে আনলেন প্রাণ!

ইংল্যান্ডকে ৯৯ রানের লক্ষ্য দিল পাকিস্তান। শুরু হলো ইংল্যান্ডের দুই লড়াই। সময়ের সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে। মরুর বুকে সূর্য হেলে পড়ছে। জয়টাও উঁকি দিচ্ছে। পাকিস্তানের সময়ক্ষেপণ শুরু হলো। ব্যাটিং অর্ডারে অদল বদল করা হলো, জো রুট সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলতে মরিয়া হয়ে পড়লেন। ইংল্যান্ড আর জয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে শুধু ওই টকটকে সূর্যটাই!

শেষ পর্যন্ত জয় হলো সময়েরই! কেউ জিতলো না, কেউ হারলো না! টেস্টটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল। আহা, ফলটা যদি হতো! তবে রোমাঞ্চ কিন্তু কমলো না। পাঁচ দিন, পনের সেশন, চার ইনিংসের সব রোমাঞ্চ যে এসে মিলেছিল ওই কয়েক মিনিটে! যেন বিশাল এক বইয়ের শেষপাতা। যেটা না পড়লে বই পড়া বৃথা, আগে কী হয়েছে তা না পড়লে শেষপৃষ্ঠায় আবার বৃথা রোমাঞ্চ খোঁজা!

১৯৯৯ সালের সেই সেমিফাইনাল-ই বা কে ভোলেন! কমেডি-ট্র্যাজেডি মিলেমিশে একাকার! কেউ হারলো না, কেউ জিতলো না, তবুও এক দল মাতলো জয়োল্লাসে, আরেক দলকে ভর করলো রাজ্যের হতাশা!

টি-টোয়েন্টির আয়ু ছোট। দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মাত্রা সীমিত। চিয়ারলিডারের নাচ আছে, কৃত্রিম বহ্নিশিখার আভা আছে, মাঠের মধ্য থেকে ক্রিকেটারদের কথা শোনার ব্যবস্থা আছে। টি-টোয়েন্টিতেও টাই হয়। ফুটবলীয়করণের অংশ হিসেবে শুরু হয় টাইব্রেকার। টি-টোয়েন্টির ভাষায়, ওয়ান ওভার এলিমিনেটর বা সুপার ওভার! সেখানেও টাই হলে বাউন্ডারির সংখ্যা বিবেচনায় এক দল জয়ী! তবে ফল কিন্তু আনতেই হবে। বিনোদনই যেখানে শেষ কথা, জয়-পরাজয় নির্ধারণ তো সেখানে অতি আবশ্যক! দিনশেষে জয়ী দলের নাম একটিই। সাড়ে তিন ঘন্টার রোমাঞ্চও শেষ ওখানেই। লোকে ঘরে ফিরে সব শেষের সাক্ষী হয়েই!

শেষ হয়, তবে 'শেষ হইয়াও হইলো না শেষ' এর অতৃপ্তিটা তো থাকে না!

তবুও আশার ভেলা

শেখ মিনহাজ হোসেন

এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে কি বাংলাদেশ হাঁটছে টি-টোয়েন্টির পরিপক্কতার দিকেই? বিশ্বকাপে সে পরীক্ষাতেই বসতে হবে নতুন করে ...

ভবিষ্যদ্বাণী করা সবসময়ই কঠিন। আর টি-টোয়েন্টি মানেই অনিশ্চয়তা। এই সংস্করণে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্সেও ধারাবাহিকতা কম। এবারের এশিয়া কাপের আগে কখনো পরপর দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জিতেনি বাংলাদেশ। তাই আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মতো নিজের ক্রিকেটবোধ বা জ্ঞানকে কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলেই শুরু করতে হচ্ছে লেখা!

কেমন হবে প্রথম একাদশ?

বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন আত্মবিশ্বাসী আর ভয়ডরহীন আক্রমণাত্মক খেলা। আর সবসময়কার 'বাঁহাতি স্পিনারের খনি' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ দলের খোলনলচে এখন পাল্টে দিয়েছে আক্রমণাত্মক পেস বোলিং। এটাই এখন নতুন বাংলাদেশ দলের "ব্র্যান্ড"! ১৫ জনের স্কোয়াডেও তাই ৫ জন পেসার। অধিনায়ক মাশরাফির সাথে মুস্তাফিজ, আল-আমিন, তাসকিন আর আবু হায়দার! এমনকি স্ট্যান্ডবাই হিসেবেও আছেন কামরুল। মূল একাদশে মাশরাফিসহ চারজন পেসার অনুমিতই।

বাংলাদেশের বাছাইপর্বের ম্যাচগুলো হবে ধর্মশালায়। আর ধর্মশালার উইকেট পেস-বান্ধব হিসেবে পরিচিত। যদি মুস্তাফিজের চোট খুব সমস্যা না করে তাহলে তাঁর সঙ্গে আল-আমিন, সাকিবের আঁটোসাটো বোলিংয়ে প্রথম ১২ ওভারে ৭৫-৮০ রানের বেশি হওয়ার কথা নয়। পাশাপাশি মাশরাফি, তাসকিনের সাথে মাহমুদউলাহ বা নাসিরের পার্টটাইম বোলিংও থাকবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ দলের বোলিং যদি মূল সামর্থ্যের কাছাকাছিও থাকে, তাহলেও বিপক্ষ দলকে ১৪০ রানের আশেপাশেই বেঁধে ফেলা যাবে।

যদি পিচ অনুযায়ী চার পেসার নিয়ে না নামতে চাওয়া হয় তাহলে তাসকিনের পরিবর্তে আরাফাত সানি আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিন পেসার আর দুই স্পিনারের বোলিং আক্রমণও সমান কার্যকরী হবে। আর ফিল্ডিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টি-টোয়েন্টিতে ভালো ফিল্ডিং করে ১০ রান কমাতে পারা মানে ম্যাচে এক প্রকার জয়ই! এশিয়া কাপে আমরা বেশকিছু ক্যাচ ছেড়েছি। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে খুব দ্রুত।

এখন ব্যাটিং শক্তি বিষয়ে আসা যাক। তামিম-সৌম্য শুরুতে জ্বলে উঠবেন এটা সাধারণ প্রত্যাশাই। পিএসএল-এ তামিম দেখিয়েছেন সময় নিয়ে খেলেও কীভাবে আক্রমণাত্মক হওয়া যায়। সৌম্য একবার ছন্দ পেলে অতি উৎসাহী হয়েই সাধারণত ভুলগুলো করেন। তবে আশার কথা, অন্যপ্রান্তে তামিম থাকলে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে খেলাতে পারবেন।

স্কোয়াড

মাশরাফি (অধিনায়ক)	
সাকিব (সহ-অধিনায়ক)	
তামিম	
সৌম্য	
মুশফিক	
মাহমুদউল্লাহ	
সাব্বির	
নাসির	
মুস্তাফিজ	
তাসকিন	**স্ট্যান্ডবাই**
আরাফাত সানি	ইমরুল কায়েস
আল-আমিন	কামরুল ইসলাম
মিঠুন	শুভাগত হোম
নুরুল হাসান	মুক্তার আলী
আবু হায়দার রনি	

সাব্বির তিনে অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেটার জন্য মুশফিক, সাকিব, রিয়াদকে কিছুটা চাপে পড়তে হয় কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। কিন্তু সাব্বির এতটাই দুর্দমনীয় ফর্মে আছেন যে রিয়াদকে ফিনিশার হিসেবেই খেলাতে হবে।

মিডল অর্ডারে সাকিব আর মুশফিক, এই দু'জনের ধরে খেলার দায়িত্ব অনেক। বড় স্কোর করতে হলে ৮ থেকে ১৭ ওভারের সময় কোনো এক প্রান্তে এই দু'জনের থাকাটা জরুরি, এতে অন্যপ্রান্তে হার্ডহিটিংটা সহজ হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে ব্যাটিংয়ে মূল দুশ্চিন্তা সম্ভবত লেট মিডল অর্ডার নিয়ে। এখানে আসলে পজিশন একটাই, নাসির হোসেন অথবা নুরুল হাসান সোহান। মুশফিকের উপর থেকে কিপিংয়ের চাপ কমাতে সোহানকে কিপিংয়ে আনা হয়েছে। এবং টেকনিক্যাল দিক থেকে সোহান বেশ ভালো কিপার। সাথে উইকেটের পেছন থেকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে দলে অতিরিক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেন। তবে এর সাথে তার মূল কাজটা হবে লেট মিডল অর্ডারে ১৯-২০ নম্বর ওভারে এসে দ্রুত রান বাড়ানো। এখন পর্যন্ত তার খেলায় সেই ব্যাটিং ঝলক পাওয়া যায়নি। তবে প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ হার্ড হিটার ব্যাটসম্যান হিসেবে চিন্তা করেই সোহানকে দলে নেয়া বলে জানিয়েছেন।

এই পজিশনে সোহানের আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী নাসির হোসেন। নাসিরের অফ স্পিনটা খুব কার্যকরী। বিশেষ করে ওয়ানডেতে "ব্রেক থ্রু" দেয়ার জন্য দলের অধিনায়ক নাসিরকে খুঁজে নেন প্রায় ক্ষেত্রেই। মাঝে অফ ফর্মে থাকলেও তাঁর ব্যাটিং সামর্থ্যও প্রমাণিত। শেষপর্যন্ত লেট মিডল অর্ডারের এই স্থানটা কার হবে সেটা ফর্ম আর ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং শক্তি বুঝে টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। তবে এই জায়গায় কেউ চোটে না পড়লে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা নাসির আর সোহানের মাঝেই হওয়া উচিত।

ব্যাটিং অর্ডারে আরেকটা কাজ করা যায়, প্রতিপক্ষের কৌশল ভণ্ডুল করতে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে মাশরাফিকে 'ফ্লোটার' হিসেবে ব্যবহার করে। বিপিএল-এর সময় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে কয়েকটি ম্যাচে কাজটি করার চেষ্টা করেছেন ম্যাশ।

তাহলে এখন পর্যন্ত একাদশটা দাঁড়াচ্ছে এমনঃ

১. তামিম ২. সৌম্য ৩. সাব্বির ৪. মুশফিক ৫. সাকিব ৬. মাহমুদুল্লাহ ৭. নুরুল হাসান/ নাসির ৮. মাশরাফি ৯. আল আমিন ১০. তাসকিন/ সানি ১১. মুস্তাফিজ

পেসারদের মধ্যে কেউ চোটে না পড়লে অনভিজ্ঞ আবু হায়দারকে নামানোর পক্ষপাতী নই আমি। একই কথা ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রেও চলে। কেউ ইনজুরিতে না পড়লে মিঠুনকেও মূল একাদশে নামানোর ভালো যুক্তি দেখিনা।

দুর্বলতা

টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিকতা বড় সমস্যা বাংলাদেশের। অনভ্যস্থতাই মূল কারণ এর। ক'দিন আগে বিপিএল হলেও এখনো খেলার ধাঁচটা পুরোপুরি আয়ত্বে আসেনি বাংলাদেশের। 'পিউর হার্ডহিটার' এর সংখ্যাও অন্য অনেক দলের চেয়ে কম। গ্যাপে বল ঠেলে সিঙ্গেলস-ডাবলস নেয়ার প্রবণতাও সবার মধ্যে নেই। এটা কিছুটা ভাবাতে পারে।

ভরসা কার যাঁরে

অবশ্যই সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং বা বোলিং, অথবা ফিল্ডিং, সাকিব প্রতি ম্যাচেই অবদান রাখতে পারেন। আর তামিম-সাব্বির-সৌম্যের টপঅর্ডার জ্বলে উঠলে প্রতিপক্ষকে চিন্তায়ই পড়তে হবে।
চোটকে জয় করে পূর্ণ সামর্থ্যে বল করতে পারলে মুস্তাফিজের বোলিং খেলা প্রেমিকার মন পড়ার চেয়েও কঠিন। মুস্তাফিজ হতে পারেন তাই এই বিশ্বকাপের বড় বিজ্ঞাপন।

বাছাইপর্বে প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, ওমান। সাম্প্রতিক ফর্ম বা প্রতিপক্ষের নাম বিবেচনায় তিন দলের সঙ্গেই সহজ জয়ের আশা করাই যায়। কিন্তু নেদারল্যান্ডস বা আয়ারল্যান্ড সবসময়ই বড় মঞ্চে অঘটন পটিয়সী দল। ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। ২০১১ সালেও বাংলাদেশের জয়টা এসেছিলো অনেক অনিশ্চয়তার পর। চারটি টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের সঙ্গে জয় তিনটিতে। হারটা প্রথম দেখাতেই, ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।

আয়ারল্যান্ডের ও' ব্রায়ান ভ্রাতৃদ্বয়ের বিধ্বংসী হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকবে, পোর্টারফিল্ডের 'ক্লেভার ক্যাপ্টেন্সি' থাকবে, সাথে থাকবে জর্জ ডকরেলের বাঁহাতি স্পিন, আর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা বয়েড র‍্যাঙ্কিনের পেস। কোচ জন ব্রেসওয়েলের মতে, দলটা তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। কন্ডিশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তারা ভারতে কিছুটা আগে থেকেই ট্রেনিং ক্যাম্পে রয়েছে। তবে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাকভাবে করতে পারলেই আয়ারল্যান্ড সেরকম দুশ্চিন্তার কারণ হবার কথা নয়।

যদি পিচ পুরো গ্রীনটপ না হয়, তাহলে আয়ারল্যান্ডের সাথে মূল কৌশল হওয়া উচিত স্পিন শক্তি। আইরিশরা সাধারণত স্পিনে দুর্বল। আর র‍্যানকিন অথবা ডকরেলকে দেখে খেলতে পারলে ব্যাটিং নিয়ে খুব বড় আশংকা দেখি না।

আয়ারল্যান্ডের চেয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ হতে পারে নেদারল্যান্ডস! ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে আয়ারল্যান্ডের দেয়া ২০ ওভারে ১৯০ রানের টার্গেট নেদারল্যান্ডস পেরিয়েছিলো কাঙ্ক্ষিত ১৪ ওভারের মধ্যেই। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ডাচরা হেরেছিলো মাত্র ৬ রানে আর ইংল্যান্ডকে ৮৮ রানে অল আউট করে ম্যাচ জিতেছিলো ৪৫ রানে! ২০০৯ সালেও ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল তারা।

গত বিশ্বকাপের ১১ জন এবারও ডাচ স্কোয়াডে রয়েছেন। আছেন স্টিফেন মাইবার্গ, টম কুপার, ওয়েসলি ব্যারেসিদের মতো প্রকৃতিদত্ত হার্ড হিটার। মাইবার্গ আর টম কুপারের শক্তিশালী জোন লং অন থেকে মিড উইকেট। গত বিশ্বকাপে তাদের প্রত্যেকটা ছয় এই জোনের মধ্যেই হয়েছে। অর্থাৎ বল টানা ফুল লেংথে ফেলা যাবে না। তাতে জায়গা পেয়ে ব্যাটসম্যানের মিড উইকেট দিয়ে উড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সেক্ষেত্রে গুড লেংথে অফ স্ট্যাম্প জোনে বল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মোটকথা,নেদারল্যান্ডসকে পেস শক্তি দিয়েই চেপে ধরতে হবে। সাথে সাকিবের স্কিড আর আর্মার তো আছেই। ডাচ বোলিং লাইন-আপও খুব শক্তিশালী নয়। এ ম্যাচে তাই বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে খুব চিন্তার কিছু নেই।

প্রথম পর্ব পার হবার পরে...

আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডসকে ডিঙ্গিয়ে আসার পর দ্বিতীয় পর্বটাও কঠিনই হবে। প্রতিপক্ষ হবে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড! আক্ষরিক অর্থেই 'গ্রুপ অফ ডেথ'। ভারতের যে সাম্প্রতিক ফর্ম তাতে ভারতের মাটিতে তারা এই গ্রুপ থেকে সেমি ফাইনালে যাবার জন্য সবচেয়ে ফেভারিট। শেষ চারের বাকি দলটি হবার জন্য বাংলাদেশকে তাই লড়তে হবে পাকিস্তান,অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের সাথে। তবে আশার কথা একটাই, প্রথম পর্বের বৈতরণী পার হতে পারলে পরবর্তীতে সেই ফ্লো-তে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশের কাছে আমাদের চাওয়া কেবল, তারা যেনো বেসিকটা ঠিক রাখে। ভারত, পাকিস্তানের সাথে আমরা মাত্রই এশিয়া কাপ খেলে এসেছি। সুতরাং তাদের শক্তিমত্তা আর দুর্বলতার দিক আমাদের জানা থাকবেই। তারাও জানবে অবশ্য। আবার অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ডের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের পিচ, আবহাওয়া অনুকূল নয়। এই সুযোগগুলোই কাজে লাগাতে হবে আমাদের।

টি-টোয়েন্টি মোমেন্টামের খেলা। প্রতিপক্ষ দলের মোমেন্টামের মূল জায়গাটা বুঝে সেখানে আঘাত করতে হবে। চাইলে অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউ জিল্যান্ড দলের বিপক্ষে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করে কখনো সাব্বিরকে ৫-৬ নাম্বারে হার্ড হিটিংয়ের জন্য নামিয়ে প্রথমে সাকিব, মুশফিক, রিয়াদদের দিয়ে ইনিংস গড়ার কাজে মন দেয়া যায়। প্রথমে পেস শক্তিকে ব্যবহার করে আর ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডার আর মিডল অর্ডারে পরিকল্পনা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আর আমাদের ভরসার স্থান মাশরাফির নেতৃত্ব তো রয়েছেই।

এশিয়া কাপের আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্সকে সাথে নিয়ে মনের গহীনে সর্বোচ্চ প্রত্যাশাই রাখি। সামনা সামনি আশার বেলুনটা খুব ওড়াচ্ছি না। তবু ওয়ানডে টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে মাশরাফির শেষ বিশ্বকাপ আর প্রায় ১০ বছর ধরে একসাথে হওয়া দলটা আমাদের জন্য অসাধারণ এক উপহার দিবে সেটাই চাওয়া। মনে সুপ্ত আশা নিয়ে মাশরাফিকে জয়ের মঞ্চেই দেখতে চাই। তবে আপাতত সেমি ফাইনাল কিংবা ফাইনাল ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি না। পচা শামুকে পা না কেটে বাছাই পর্বটা ঠিকঠাক পার করুক মাশরাফি-বাহিনী, এটাই প্রত্যাশা!

বেলাশেষে

রিজওয়ান আবীর

টি-টোয়েন্টি নতুন ফরম্যাট, তবে এবারের বিশ্বকাপে শেষ ঝলকটা দেখাতে পারেন পুরোনো অনেকেই...

সময়ের সমুদ্রে ডুবে থাকা মানুষেরই যে সময় থাকে না, রবি ঠাকুর তো সেটা একশ বছর আগেই বলে গিয়েছেন। মানুষ তারুণ্যের পূজারী, শক্তি-শৌর্য মানুষকে চিরটাকাল আকর্ষণ করেছে। রূপকথার পায়রাগুলো তাই পেখম মেলে কোনো তরুণের হাত থেকেই, কল্পলোকে সৌন্দর্যের সুধায় অবগাহন করতে হয় কোনো তরুণীরই পল্লবিত স্মিতহাস্যে। নতুন প্রাণের উচ্ছ্বাসই কেবল কাব্যে গতি আনে, জীবনে প্রাণবন্ততা আনে। রঙের ছোপ কেবল তারুণ্যে লাগে- বয়স ফুরোনোর পর জীবনটা বন্দী হয় সাদাকালো সেলুলয়েডে! বার্ধক্যের জায়গা নেই এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে, অজস্র ছাপ রাখার পরও একজন বুড়োকে তাই সবকিছু ছেড়ে আসতে হয়, জায়গা করে দিতে হয় নতুনদের জন্য। জীবনটাই যেখানে এমন, ক্রিকেটই বা তাঁর বাইরে কেন থাকবে? জীবনের ছাপ যদি কোনো খেলায় সবচেয়ে বেশী থেকে থাকে, সেটা তো ক্রিকেটই। পথ হারিয়ে ফেরা ক্লান্ত পথিক যখন হন্যে হয়ে দিশা খুঁজে ফেরেন, একজন ফর্মহীন ব্যাটসম্যানের অবস্থাটা তো তাঁর চেয়ে খুব বেশি ব্যতিক্রম নয়! ক্রিকেট আর জীবন বড় বেশি হাত ধরাধরি করে চলে, সময়ের পরিক্রমায় আড়ালে চলে যাওয়া তারকারাও তাই এখানে অগোচরে যেতে সময় নেন না! তারুণ্য হারাবার বুলির তোড়ে কখনো বয়স হবার আগেই কাউকে কাউকে 'অপাংক্তেয়' খেতাব নিয়ে বিদায় বলতে হয়! জীবনভর পাওয়া তাই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কখনো না কখনো তাকে যে খোয়াতেই হয়!তবুও কেউ কেউ থাকেন, আপাতদৃষ্টিতে হয়তো যোদ্ধা নয়। তবে তাঁরা লড়ে যান, প্রাণপণ। ভাগ্যের হাতে সবকিছু সঁপে দিতে তাঁদের বড্ড অনীহা! অপাংক্তেয় না হয়ে অকুতোভয় বীরের মত তুলে রাখেন শাণিত তলোয়ার।

তবে শুধু ক্রিকেটে নয়, যেকোনো খেলাতেই এটা খুব ক্লিশে একটা নিয়মের গল্প- বয়সের অজুহাতে কাউকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়া। সাধারণ কেউ ওখানেই হার মানেন, আর বয়সকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অকুতোভয়রা সেখান থেকেই হয়ে উঠেন অসাধারণ! কালোত্তীর্ণ খেতাব দেয়া হয় তাঁদেরকেই, উন্নীত হন শিখরে, মহাকাল বিজয় তিলক পড়ায় এদের কপালেই! তবে সেটা হয় শেষে, তার আগের সময়টা কিভাবেই বা পেরিয়ে আসেন তাঁরা!

কেমন লেগেছিল যুবরাজ সিংয়ের? ২০১১ বিশ্বকাপের নায়ক তিনি, অর্জনের খেরোখাতার সীমারেখা নেই টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম কুশীলব! স্মরণীয় মুহূর্তের স্রোতে ভারতীয়দের ভাসিয়েছেন অসংখ্যবার! টি-টোয়েন্টির প্রথম বিশ্বকাপেও দলকে ফাইনালে তোলার অনেকখানি কৃতিত্ব তো 'যুবি'রই! সে তাঁর বাড়িতেই ঢিল পড়লো, ২১ বলে ১১ রানের ইনিংসটাকে দায়ী করে কুশপুতুলও পোড়ানো হলো কয়েক জায়গায়! অতিচর্চিত সেই ইতিহাস আর না কপচিয়ে হয়তো আমরা এড়িয়ে যেতে পারি; কিন্তু ক্যান্সার থেকে ফিরে আসা একজন যুবরাজ সিং কি তা ভুলতে পারবেন কখনো? হৃদপেশীর কোন না কোন অলিন্দে তো নিশ্চয়ই এখনো বেজে চলেছে সেই বিষের বাজনা। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ওই ফাইনালের পর তাঁর এপিটাফ আসলে লিখেননি কে? তিনি আবার ফিরে আসবেন এই বিশ্বাসটুকুও বা কয়জনের ছিল? যুবরাজ অবশ্য বলতে পারেন, আমি যে বেঁচে ফিরব এই আশাটুকুই যেখানে ছিল না সেখানে এ আর এমন কি! চাইলেই তাই যাচ্ছে না- পারা যাচ্ছে না ক্রিকেটকে শুধু খেলা হিসেবে রেখে জীবনকে বৃহৎ করে দেখতে! অন্তত যুবরাজ সিংয়ের বেলায় তো নয়ই!

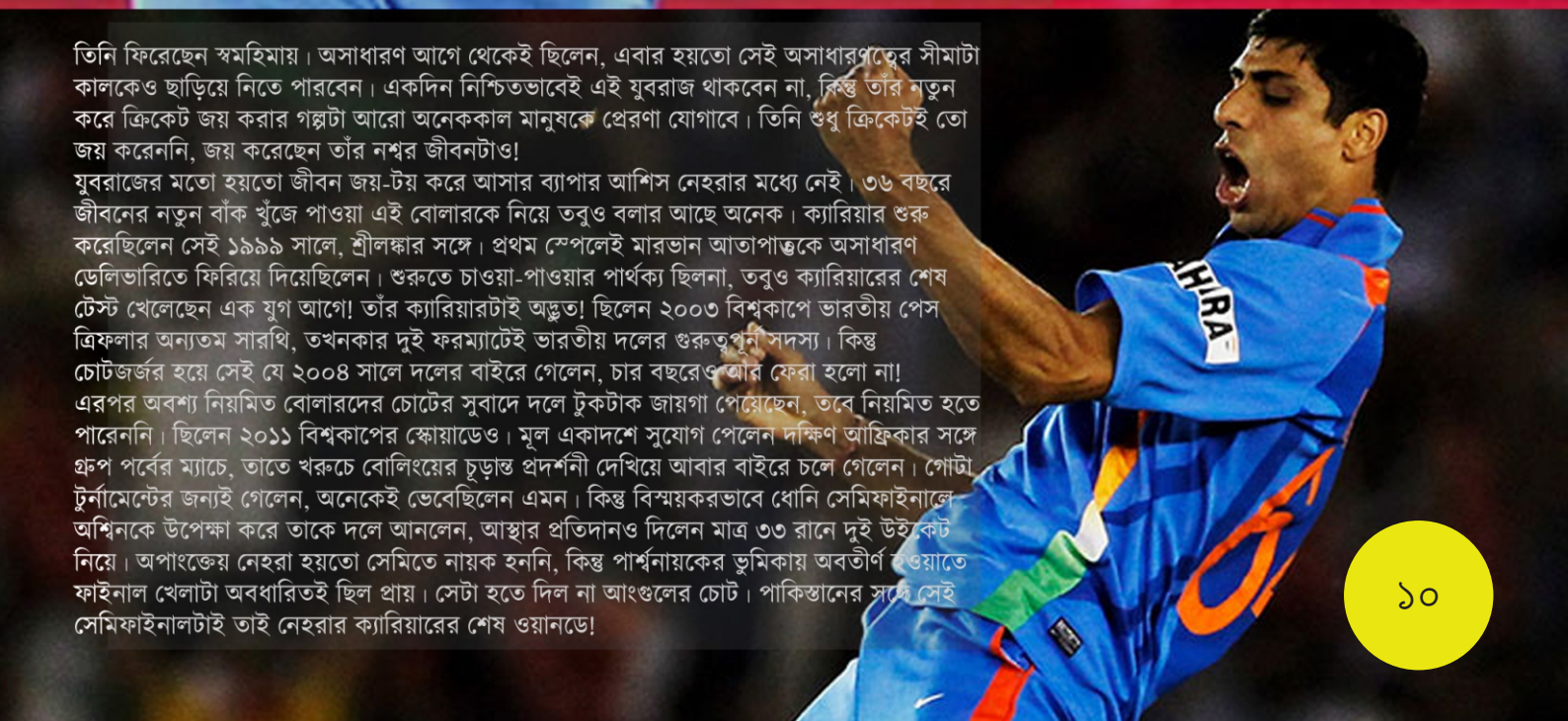

তিনি ফিরেছেন স্বমহিমায়। অসাধারণ আগে থেকেই ছিলেন, এবার হয়তো সেই অসাধারণত্বের সীমাটা কালকেও ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। একদিন নিশ্চিতভাবেই এই যুবরাজ থাকবেন না, কিন্তু তাঁর নতুন করে ক্রিকেট জয় করার গল্পটা আরো অনেককাল মানুষকে প্রেরণা যোগাবে। তিনি শুধু ক্রিকেটই তো জয় করেননি, জয় করেছেন তাঁর নশ্বর জীবনটাও!

যুবরাজের মতো হয়তো জীবন জয়-টয় করে আসার ব্যাপার আশিস নেহরার মধ্যে নেই। ৩৬ বছরে জীবনের নতুন বাঁক খুঁজে পাওয়া এই বোলারকে নিয়ে তবুও বলার আছে অনেক। ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সেই ১৯৯৯ সালে, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে। প্রথম স্পেলেই মারভান আতাপাত্তুকে অসাধারণ ডেলিভারিতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শুরুতে চাওয়া-পাওয়ার পার্থক্য ছিলনা, তবুও ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলেছেন এক যুগ আগে! তাঁর ক্যারিয়ারটাই অদ্ভুত! ছিলেন ২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতীয় পেস ত্রিফলার অন্যতম সারথি, তখনকার দুই ফরম্যাটেই ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ন সদস্য। কিন্তু চোটজর্জর হয়ে সেই যে ২০০৪ সালে দলের বাইরে গেলেন, চার বছরেও আর ফেরা হলো না! এরপর অবশ্য নিয়মিত বোলারদের চোটের সুবাদে দলে টুকটাক জায়গা পেয়েছেন, তবে নিয়মিত হতে পারেননি। ছিলেন ২০১১ বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও। মূল একাদশে সুযোগ পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে, তাতে খরুচে বোলিংয়ের চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে আবার বাইরে চলে গেলেন। গোটা টুর্নামেন্টের জন্যই গেলেন, অনেকেই ভেবেছিলেন এমন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ধোনি সেমিফাইনালে অশ্বিনকে উপেক্ষা করে তাকে দলে আনলেন, আস্থার প্রতিদানও দিলেন মাত্র ৩৩ রানে দুই উইকেট নিয়ে। অপাংক্তেয় নেহরা হয়তো সেমিতে নায়ক হননি, কিন্তু পার্শ্বনায়কের ভুমিকায় অবতীর্ণ হওয়াতে ফাইনাল খেলাটা অবধারিতই ছিল প্রায়। সেটা হতে দিল না আংগুলের চোট। পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সেমিফাইনালটাই তাই নেহরার ক্যারিয়ারের শেষ ওয়ানডে!

এই নেহরাকে সবাই ভুলে ছিলেন। তাঁর জায়গা ছিলনা আধুনিক 'টিম ইন্ডিয়ায়'। তবে নেহরা নুয়ে পড়েননি, বড় দৈর্ঘ্যের ম্যাচে জায়গা হবেনা বুঝেই হয়তো শাণিত করেছেন নিজেকে, ছোট ফরম্যাটে। আইপিএলে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে আবার ফিরেছেন দলে। ৩৭ বছরের এই বুড়ো নেহরাই এখন ছোট ফরম্যাটে ভারতীয় পেস আক্রমণের নেতা। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর উপস্থিতিতেই তো তাদেরকে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত! হরভজন সিং সেদিক থেকে অবশ্য ভাগ্যবান, যেমন ভাগ্যবান রঙ্গনা হেরাথ। হরভজন তো টানা ১১ বছর বলতে গেলে একাই স্পিন আক্রমণকে টেনেছেন। মুরালি পরবর্তী যুগে হেরাথও করেছেন তাই। তবে হেরাথের যখন নতুন করে শুরু হচ্ছে, হরভজনের তখন শেষের ঘণ্টা বাজছে। ২০১১ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালটা খেলেছিলেন হেরাথ, মুরালির চাইতে তাঁর স্পেলটাই কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটায় বেশি কার্যকরী ছিল। ফাইনালে তবুও টিম কম্বিনেশন ঠিক রাখতে সুযোগ পাননি। ভাজ্জি অবশ্য বিশ্বকাপ জিতেছেন, কিন্তু পুরো টুর্নামেন্টে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। তেমন কোনো ম্যাজিক স্পেল আর ছিল কোথায়? বিশ্বকাপ ফাইনালের পর তাই আর ৩ ওয়ানডেতে সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর যখন সুযোগ পেলেন তখন পেরিয়ে গেছে ৪ বছর! আর হেরাথ এখন শ্রীলঙ্কা দলের অপরিহার্য সদস্য। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হেরাথ যাদু খুবই দরকার। ভাজ্জি হয়তো মূল একাদশে অতোটা সুযোগ পাবেন না, তবে দলে তাঁর অভিজ্ঞতা যে প্রভাব রাখবে নিশ্চিতভাবেই!

মোহাম্মদ সামির গল্পটা হেরাথ-হরভজনের চেয়ে একটু আলাদা। ইমরান খান তাঁকে বলেছিলেন 'আধুনিক ম্যালকম মার্শাল'! টেস্ট অভিষেকেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১০৬ রান দিয়ে আট উইকেট। তৃতীয় টেস্টেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক! এর কয়দিন পর হ্যাটট্রিক পেলেন ওয়ানডেতেও। ওয়াসিম-ওয়াকারের বিদায়ের মুহূর্তে তাঁকেই ভাবা হচ্ছিল পাকিস্তানের পরবর্তী প্রজন্মের পেস আক্রমণের কান্ডারি। তবে সে কান্ডারির পরের ইতিহাস রীতিমতো দুঃসহ, পাকিস্তানীদের জন্যেও কি নয়? সিরিজের পর সিরিজ দলে খেলেছেন, কিন্তু প্রভাব ফেলতে পারছেন না। ছোট বোলিং রান-আপে অস্বাভাবিক গতি সৃষ্টির ক্ষমতা, বল দুইদিকে সুইং করানোর প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা নিয়েও আরে এগোতে পারেননি। ২০০৬ সালে দল থেকেই বাদ, তারপর থেকেছেন যাওয়া আসার মধ্যে। শুরুর অমন পারফরম্যান্সের পরও তাই তাঁর টেস্ট সংখ্যা মাত্র ৩৬, শেষ টেস্টটাও খেলেছেন চার বছর আগে। তবে এর চেয়েও দুঃসহ হচ্ছে টেস্ট বোলিং গড়, ৫২.৭৪! গত বছর অবশ্য জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ওয়ানডে খেলেছিলেন, কিন্তু সেটার পরও প্রায় বছরখানেক হয়ে গেছে। পিএসএলের পারফরম্যান্স দিয়ে এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের ম্যাচের ওই নো-বল কেলেঙ্কারির পর আদৌ আর মূল একাদশে জায়গা পাবেন কি! এশিয়া কাপের শেষ ম্যাচেও তো ছিলেন একাদশের বাইরেই! বয়স হয়ে গেছে ৩৬, আন্তর্জাতিক আঙিনায় সামির বিচরণের নতুন কোনো গল্প লিখতে হলে হয়তো আশ্রয় নিতে হবে সেই ফিনিক্স পাখির গল্পেরই!

ওপরের লেখা পড়ে মনে হতে পারে, সব বুড়োদের আবাস বোধহয় এই গোলার্ধেই! না অবশ্যই। নিউজিল্যান্ড দলে আছেন যেমন গ্র্যান্ট এলিয়ট। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান গ্রেট গেইলের বয়সও কিন্তু বেলায় বেলায় কম হল না! ৩৩-৩৪ বয়স হয়ে গেছে এমন খেলোয়াড়দের সংখ্যা সামনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেহায়েত কম নয়! এদের কেউ 'কামব্যাক' করেছেন এপিটাফের মধ্যে থেকে, কেউবা আবার ফর্মের বিচারে মাঝারি মানে থেকে যাচ্ছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, হয়তো শেষবারের মত!

খেলাধুলার জগতটা রূপকথার রাজ্যের মত, প্রজাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা রাজার মত খেলোয়াড়েরাও এখানে থাকেন সাধারণ দর্শকদের মানসপটে। সেই মানসচিত্রটাও মুছে যায় জাদুর রংপেন্সিলে আঁকা ছবির মত, চোখের আড়াল হবার সাথে সাথে হারিয়ে যান তারকারা। অবসর ভাবনা তাই একজন খেলোয়ারের জন্য দুঃসহ, এখন মানুষের জন্যেও কি নয়? যেকোনো বিদায়ে দুঃখের ছোপ থাকে, বিষাদের বিস্তৃতি থাকে। বিদায় নিতে তাই কেউ চায়না, হেরে যাওয়া অবস্থান থেকে তো নয়ই। এজন্যেই এপিটাফ লেখা হলেও টেন্ডুলকার, গাংগুলি, পন্টিং, আকরামরা ফিরে আসেন। দৃপ্তকণ্ঠে আবার শুনিয়ে দেন বিজয়ের গান। এই টি-টোয়েন্টির বিশ্ব আসরেও তাই আপাত বয়সোত্তীর্ণ অনেক খেলোয়াড় খেলবেন, সে আশাতেই। হয়তো যশ কামাবেন, হয়তো ব্যর্থ হয়ে শেষবারের মতোই হারিয়ে যাবেন ইতিহাসের পাতায়।

জীর্ণতার চাদর মিলিয়ে যাবে যাক, টি-টোয়েন্টির আগত আসরটা 'বুড়ো'দের প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়েই বিদায় দিক না! স্বপ্নের মতোই হোক না এঁদের শেষ! স্বপ্নটা হয়তো স্বপ্নই থাকবে, কিন্তু আশা করতে তো আর দোষ নেই!

ঐ নতুনের কেতন ওড়ে

মাহবুল্লাহ ত্বকী

চোখটা হয়তো সবার ডি ভিলিয়ার্স, গেইল, কোহলিদের ওপরেই সবার থাকবে, কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে নায়ক হয়ে উঠতে পারেন নতুনদের অনেকেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা জাগানো সেরকম কয়েক জনেরই গল্প...

মুস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ ক্রিকেটে সময়ের অন্যতম সেরা আবিষ্কারকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। গত জুনে ভারতের বিপক্ষে অভিষেকে দুই ওয়ানডে মিলিয়ে নিয়েছিলেন রেকর্ড এগারো উইকেট। পরের গল্পটা কেবলই নিজেকে নিত্যনতুন উচ্চতায় উঠিয়ে নেয়ার। গত বছরজুড়ে সপ্রতিভ পারফরম্যান্সে জায়গা করে নিয়েছিলেন আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে। স্লোয়ার-কাটারে প্রতিনিয়ত গলদঘর্ম করে চলেছেন বিশ্বের বাঘা সব ব্যাটসম্যানকে। উপমহাদেশীয় উইকেটে এমন সাফল্য পুঁজি করে প্রতিপক্ষ অধিনায়কদের সমীহও আদায় করে নিচ্ছেন। চোট বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আসছে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের সবচেয়ে বড় অস্ত্রই হয়ে উঠবেন কুড়ি বছরের তরুণ বাঁহাতি পেসার।

সৌম্য সরকার (বাংলাদেশ)

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন। দেশে ফিরে পাকিস্তানের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে তুলে নেন ক্যারিয়ারের প্রথম শতক। রান পেয়েছেন ভারত ও দ. আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজেও। টি-টোয়েন্টিতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে বড় সংগ্রহ গড়তে পারেন নি। তবে তামিমের সাথে তাঁর জুটিটা বাংলাদেশের ইনিংস উদ্বোধনে আত্মবিশ্বাসটুকু বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত)

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকেই ৩২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন। ভুবনেশ্বর কুমারের চোট গত জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফরে সুযোগ করে দেয় প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সি গায়ে তোলার। অভিষেক একদিনের আন্তর্জাতিকে ৪০ রানে ২ উইকেট তুলে নেয়ার পর অভিষেক টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকেও চমকে দেন আহমেদাবাদের এই তরুণ। ডেভিড ওয়ার্নারসহ সাজঘরে ফেরান ৩ জনকে। এ পর্যন্ত খেলা নয় ম্যাচের আটটিতেই উইকেটের দেখা পেয়েছেন। ওভারপ্রতি রানের খরচ ছয়ের নীচে রাখার সামর্থ্যটুকুও ঈর্ষণীয়। চলতি এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে পেয়েছেন ২টি মেডেন। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে বুমরাহর করা ১৮টি বলের ১৬টিই ছিল ডট!

হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত)

ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে নিজেকে চেনান। গত বছর সুযোগ মিলে যায় আইপিএল এর একাধিক ম্যাচে। সপ্রতিভ পারফরম্যান্সে পেয়ে যান ম্যাচসেরার পুরস্কার, মুম্বাইয়ের হয়ে কলকাতার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচে ৩১ বল থেকে করেন ৬১ রান। জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফরে অভিষেক টি-টোয়েন্টিতে তুলে নেন স্মিথ-ফকনারদের উইকেট। এরপর শ্রীলংকার বিপক্ষে সিরিজ হয়ে চলতি এশিয়া কাপ, পান্ডিয়া হয়ে উঠেছেন ভারতীয় দলের অপরিহার্য পেস অলরাউন্ডার।

অ্যাশটন অ্যাগার (অস্ট্রেলিয়া)

এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি করে টেস্ট আর ওয়ানডে খেললেও টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে অভিষেকটা এখনও হয় নি। তবে ২০১৩ সালের অ্যাশেজে টেস্ট অভিষেকেই চমকে দিয়েছিলেন। ১১ নম্বরে নেমে ব্যাট হাতে করেন রেকর্ড ৯৮ রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক ফর্ম খুব আশাপ্রদ নয়। তবে উপমহাদেশের কন্ডিশন বিবেচনাতেই লংকান বংশোদ্ভূত স্পিন অলরাউন্ডারকে স্কোয়াডে রাখা। সুযোগ পেলে নিজেকে কতোটা চেনাতে পারবেন সেটা সময়ই বলে দেবে।

উসমান খাওয়াজা (অস্ট্রেলিয়া)

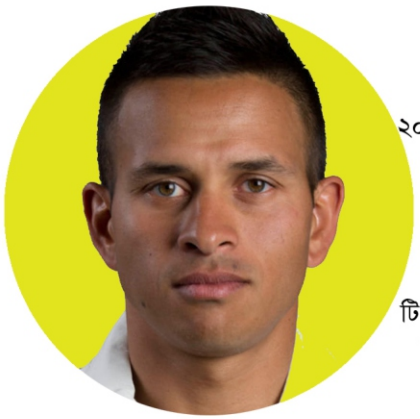

টেস্ট অভিষেক ২০১১ সালে। একদিনের আন্তর্জাতিকে হাতেখড়ি হয়েছে সে-ও তিন বছর। ২০১১ সালের অ্যাশেজে প্রথম সুযোগেই জাত চিনিয়েছিলেন। কিন্তু সপ্রতিভ শুরুর পর ইনিংস লম্বা করতে না পারার ব্যর্থতায় দলে জায়গাটা স্থায়ী হয় নি। লম্বা সময় পর গত নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ফিরে টানা দুই টেস্টে পেয়ে যান শতক। চার বছরের ক্যারিয়ারে যেখানে একটিও শতক ছিল না, সেখানে চার মাসে খাওয়াজার নামের পাশে চার শতক! রান পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একদিনের সিরিজেও। একমাত্র টি-টোয়েন্টিটা খেলেছেন গত জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে নিজেকে প্রমাণের সুযোগটা তাই একেবারে বিশ্বকাপের মাঠেই পাবেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

স্যাম বিলিংস (ইংল্যান্ড)

গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কাছে হেরে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয়ার পর জাতীয় দলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয় ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সে ধারাবাহিকতায় একাধিক তরুণ ক্রিকেটারের সাথে ডাক পান বিলিংসও। গত বছর জুনে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত খেলেছেন ৫টি ওয়ানডে ও ৬টি টি-টোয়েন্টি। কেন্টের এই তরুণ মূলত একজন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হলেও জাতীয় দলে উইকেট সামলানোর সুযোগটা এখনও সেভাবে পান নি। ব্যাট হাতেও বড় সংগ্রহ পাওয়া হচ্ছে না। তবে সাবেক ইংলিশ ক্যাপ্টেন মার্কাস ট্রেসকথিক বিশ্বাস করেন খুব দ্রুতই দলে জস বাটলারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবেন বিলিংস। স্লগ ওভারে মেরে খেলার হাত আর উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি আউটফিল্ডেও সপ্রতিভ দক্ষতা টি-টোয়েন্টির স্পেশালিস্ট হিসেবেই তাঁকে জায়গা দিয়েছে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে।

কাগিসো রাবাদা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক একদিনের আন্তর্জাতিকে ছয় উইকেট নিয়ে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। গত জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক টেস্টে নিয়েছেন রেকর্ড ১৩ উইকেট। পথচলার সবে শুরু, তবে রাবাদা নিজেকে চেনাচ্ছেন সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ পেসারদের অন্যতম হিসেবেই। ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বড়দের আসরে প্রোটিয়াদের একটি বিশ্বকাপের আক্ষেপ কি ঘোচাতে পারবেন?

দুশমন্ত চামিরা (শ্রীলংকা)

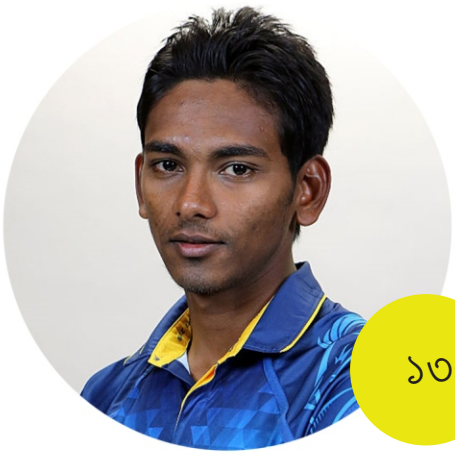

গতিটাই সবচেয়ে বড় সম্বল তরুণ লংকান পেসারের। অভিষেক আন্তর্জাতিক উইকেটটা নিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের রস টেলরকে বোল্ড করে, ১৪৬ কি.মি. গতিতে ছোঁড়া বলে। একটানা বল করতে পারেন ১৪০ কিলোমিটারের উপর। ৮ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত সেরা বোলিংটা করেছেন সম্প্রতি শেষ হওয়া এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিপক্ষেই, ৩০ রানের বিনিময়ে নিয়েছিলেন সাব্বির-সাকিবের গুরুতপূর্ণ উইকেটসহ মোট ৩ উইকেট। এর আগে ভারতের মাঠে দ্বিপাক্ষিক সিরিজেও আলো ছড়িয়েছেন। সহায়ক উইকেটে চামিরার পেস মারণাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে যে কোনো ব্যাটসম্যানের জন্যই।

জয়তু টি–টোয়েন্টি !

অম্লান মোস্তাকিম হোসেন

ওপার বাংলার এক স্বনামধন্য ক্রীড়া সাংবাদিক (নামটা না হয় উহ্যই থাক!) নাকি একবার তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলেন,আরে ছো!দুপুর বেলা ভরপেট খেয়ে যেখানে সবাই ঢেঁকুর তুলতে তুলতে মাঠে নামে,সেটা আবার খেলা নাকি? টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি তাঁর এই গাত্রদাহের কারণটা অবশ্য জানা যায় না। তবে টি-টোয়েন্টির যুগে এসে নিশ্চয় সেই নাক সিঁটকানো ভাবটা আর নেই! যাক বাবা,এখানে তো আর অত ভোজনবিলাসের হ্যাপা নেই। কোনোমতে কিছু নাকেমুখে গুঁজেই নেমে যাও মাঠে। কয়েকজন বোলারকে ঠেঙিয়ে,গোটাকয়েক চার ছয় মেরে আবার ফিরে এসো প্যাভিলিয়নে!

টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আরেকটা গল্প খুব চালু আছে। মহামতি হিটলার নাকি একবার ইংল্যান্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখলেন,কয়েকজন লোক তক্তা জাতীয় কিছু একটা নিয়ে গোলমতো কিছু একটা পিটিয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ দেখেও খেলাটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না হিটলার। পরের দিন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন,ঠিক সেভাবেই খেলাটা চলছে। একজনকে শুধালেন,‘আচ্ছা,এটা কি নতুন খেলা?’ ওপাশ থেকে উত্তর এলো,‘না, মশাই, কালকের খেলাটাই চলছে। ফল পেতে আরও দুই-তিন দিন লেগে যেতে পারে’। বিষম চটে হিটলার তখনই ঠিক করে ফেললেন,আর যাই হোক,জার্মান মুলুকে অন্তত এই খেলাটা ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ফলের জন্য যেখানে দিনের পর দিন রোদেপুড়ে কয়লা হয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়,সেটা আবার খেলা নাকি ?

কাহিনিটা কতটুকু সত্যি,আর কতটুকু অতিরঞ্জিত, সেটা তর্কসাপেক্ষ। তবে এই টি-টোয়েন্টির যুগে হিটলার নিশ্চয় ক্রিকেট নিষিদ্ধ করার কথা দুই বার ভাবতেন। এখন আর খেলা শেষের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা নেই, তিন ঘণ্টাতেই মামলা খতম। বলের ছোটাছুটিরও বিরাম নেই,একটু পর পর আছড়ে পড়ছে মাঠের বাইরে। চার-ছয়ের বৃষ্টি দেখতে দেখতে বিরক্ত? কুছ পরোয়া নেহি,চোখের প্রশান্তির জন্য উর্বশীদের সুললিত নৃত্যও দেখে নেওয়া যায়। আর একটু পর পর রক্ত চনমনে করে তোলা বাদ্য-বাজনা তো আছেই। কে বলে এটা খেলা,এটা তো আসলে একটা বাহারি মেলা!

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে,বিনোদন হলো-আনন্দ হলো-ফুর্তি হলো, কিন্তু এর মধ্যে খেলাটা কোথায় ? কোথায় সেই হাই ব্যাকলিফটের কবিতার মতো বাঙময় কভার ড্রাইভ? কোথায় সেই ব্যাটে আলতো করে চুমু খেয়ে চলে যাওয়া স্ট্রেইট ড্রাইভ? মানলাম,এসবের ছিটেফোঁটা না হয় কুড়ি ওভারের যুগেও মাঝেসাঝে এক আধটু দেখা যায়, কিন্তু ছাতার মতো ঘিরে ধরা ফিল্ডার বলয় থেকে ডাউন দ্য উইকেটে বেরিয়ে আসা সেই অলস সৌন্দর্যই বা কই ? ব্যাটসম্যানদের শরীর বরাবর ধেয়ে আসা একের পর এক বাউন্সার খুঁজতে গেলেও তো হতাশ হতে হবে।

ইয়ে,বড্ড বেশি বিশুদ্ধবাদীর মতো কথা হয়ে যাচ্ছে,তাই না?এই শর্টকাটের যুগে কার দায় পড়েছে,এসব ভাবাবেগ নিয়ে পড়ে থাকার? ফেসবুকে দুই চার লাইন লিখেই তো এখন হাজারে হাজারে লাইক কামানো যায়,অন্তহীন কিবোর্ড গুঁতিয়ে কে-ই বা দুই মলাটের কিছু একটা লিখবে ? আর লিখলেও সেটা চোখের ওপর নির্যাতন করে পড়বেই বা কজন? যেখানে মুঠোফোনের এক ক্লিকে ‘ফিলিং হ্যাপি’ লিখে কাজ সারা হয়ে যায় ?

যুগটাই তো আসলে টি-টোয়েন্টির। চৌরাসিয়ার বাঁশি এখানে চেক-ইন আর সেলফি দেওয়ার উপলক্ষ,চার ছক্কা হই হই,বল গড়াইয়া গেল কই-এর সঙ্গে একটু ফ্ল্যাশমব না হলে তো ঠিক জমে না। জীবনানন্দ এই যুগে থাকলে হয়ত “আমি অত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না” লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। না চাইলেও তাঁকে তাড়াতাড়িই যেতে হতো। এ তো টেস্টের যুগ নয়,হেলেদুলে ক্রিজে গেলেন;এ হচ্ছে ধুমধাড়াক্কা টি-টোয়েন্টির যুগ। বরং দেখা যেত,পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেনকে না খুঁজে দুদন্ড শান্তি খুঁজতেন প্রমোদবালিকাদের নৃত্যেই।

জীবনটাই যখন টি-টোয়েন্টির ক্রিকেট আর কী দোষ করল? আমরাও বরং ওসব টেস্ট-ফেস্টের আদিখ্যেতা বাদ দিয়ে চার-ছক্কাতেই বুঁদ হয়ে থাকি। এই যুগে তো আবেগ নয়, বেগটাই যে বেশি দরকার!

স্মৃতির আয়নায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

মোহাম্মদ শামীম হোসেন

ক্রিস গেইলের সেঞ্চুরি দিয়ে সূচনা, সাঙ্গা-জয়ার রাজসিক বিদায়ে শেষ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ববর্তী আসরগুলোতে রোমাঞ্চের পারদ কম উঠানামা করেনি!

২০০৭- সেই ভারতই চ্যাম্পিয়ন

"বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি অনেককেই বিশাল শট খেলতে দেখেছি, এর আগে কাউকে এভাবে মারতে দেখি নি। বিশাল! ...সত্যিই বিশাল!"

স্টুয়ার্ট ব্রডের ১৯তম ওভারে যুবরাজ সিংয়ের অবিশ্বাস্য ব্যাটিং দেখে এমনটাই বলেছিলেন ধারাভাষ্যে থাকা ডেভিড লয়েড। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের ম্যাচটা ছিল গ্রুপপর্বের, সেমিফাইনালেও যুবরাজ ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেখানে পাকিস্তানকে হারানো, গ্রুপপর্বের মতো করেই। তবে গ্রুপপর্বের ম্যাচটা যেন ছিল টি-টোয়েন্টির নতুন বিজ্ঞাপন, টাই ম্যাচে বোল-আউটে জিতেছিল ভারত। ফাইনালে বোল-আউট লাগেনি, মিসবাহর এক 'স্কুপ'ই যথেষ্ট ছিল সে ম্যাচ, সে বিশ্বকাপকে ইতিহাসের পাতায় নিয়ে যেতে। যে বিশ্বকাপের শুরুটা হয়েছিল ক্রিস গেইলের দশ ছক্কায় রাঙানো ১১৭ রানের ইনিংসে, শেষ হয়েছিল মিসবাহর সেই মৃত্যুপরায়ণ শটে! জিম্বাবুয়ে চমকে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে, বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। বাংলাদেশের সঙ্গেই হ্যাটট্রিক পেয়েছিলেন ব্রেট লি। টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ স্কোরটাও এসেছিল সে আসরেই, কেনিয়ার সঙ্গে শ্রীলঙ্কা করেছিল ২৬০। তবে সব ছাপিয়ে ২০০৭ এর সবচেয়ে বড় 'ট্যাগলাইন' একটাই, পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির দল!

২০০৯- দুঃখ ভুললো পাকিস্তান

লর্ডসে উদ্বোধন। যেন ডেভিড আর গোলিয়াথের লড়াই! ইংল্যান্ড আর নেদারল্যান্ড। লর্ডসকে স্তব্ধ করে দিল ডাচরা, দৃশ্যপটে আবার স্টুয়ার্ট ব্রড, এবার সরাসরি থ্রোতে স্ট্যাম্প ভাংতে ব্যর্থ তিনি! দ্বিতীয় আসরও দুঃস্মৃতি উপহার দিল ব্রডকে, তবে দুই বছর আগের দুঃখ ভুললো পাকিস্তান! শহীদ আফ্রিদি হলেন সেমিফাইনাল ও ফাইনালের ম্যাচসেরা। ইমরান খানের পর আরেক 'খান' এর হাত ধরে পাকিস্তান পেলো বৈশ্বিক কোনো ট্রফির স্বাদ। ইউনুস খান তো হয়ে পড়লেন আবেগীই। সবসময় বিশ্বকাপ হাতে তোলার স্বপ্ন দেখতাম। আমার পুরো ক্যারিয়ারের একটাই ইচ্ছে, 'আমার দলকে '৯২ দলের মত মনে রাখবে সবাই'।
আর কেউ না হোক, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই মনে রেখেছে সে আসর!

২০১০- অবশেষে ইংল্যান্ড

"দ্যাট উইল ডু নাইসলি, থ্রু মিড উইকেট...ইংল্যান্ড চার্জ অন টু দ্য ফিল্ড! পল কলিংউড এন্ড হিস টিম হ্যাভ ওন দ্য টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ফাইনাল!"
ধারাভাষ্যে টনি গ্রেগের ভরাট কণ্ঠের উচ্চারণ নিশ্চয়ই কানে বাজে এখনও ইংলিশদের! তিনি যে বলছিলেন ইংল্যান্ডের ইতিহাস গড়ার কথা! কতদিনের আক্ষেপের ক্ষতে যে একটু হলেও প্রলেপ দিয়েছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের এই বিশ্বকাপ! পল কলিংউডকে নিয়ে তাই ইংলিশ ক্রিকেটে আলাদা অধ্যায়ও লেখা থাকবে হয়তো! অস্ট্রেলিয়াকে ফাইনালে যে অবলীলাতেই হারিয়েছিল ইংলিশরা! সেবারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে একমাত্র ফাইনাল খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া! মাইক হাসি অবিশ্বাস্য এক জয় এনে দিয়েছিলেন সেমিফাইনালে, তবে ইংলিশদের আক্ষেপ ঘোচানোর ম্যাচে শুধু আক্ষেপেই পুড়তে হয়েছে অজিদের!

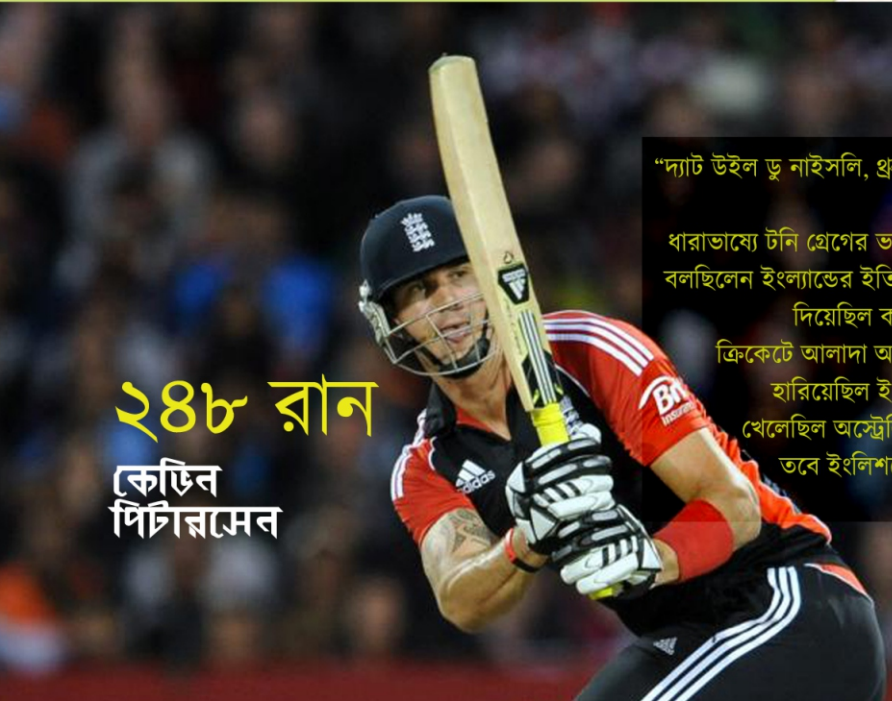

২৪৯ রান
১১ উইকেট
শেন ওয়াটসন

২০১২-লঙ্কার দেশে ক্যালিপসো সুর

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ক্রিস গেইল বলেছিলেন, 'স্যরি শ্রীলঙ্কা, তোমাদের কোনো সুযোগ নেই।' সে সুযোগ দেননি গেইলরা। মারলন স্যামুয়েলসের ব্যাটিং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এনে দিয়েছিল সাগরবেলায় অপার আনন্দে ভেসে যাওয়ার এক সুযোগ! সে আনন্দের তোড়েই হয়তো ভেসে গেছে অজন্তা মেন্ডিসের জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ৮ রানে ৬ উইকেট, ব্রেন্ডন ম্যাককালামের বাংলাদেশের সঙ্গে ৫৮ বলে ১২৩ রানের ইনিংস বা শেন ওয়াটসনের অজিদের হয়ে একাই লড়ে যাওয়ার গল্পগুলো! তাতে কী!

২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মানেই তো ক্যারিবীয় উত্থান-আশার গল্প, যার মঞ্চায়ন করেছিলেন স্যামি-গেইল-ব্রাভোরা, গ্যাংনাম নাচ নেচে!

বিরাট কোহলি
৩১৯ রান

২০১৪- শ্রীলঙ্কার দায়মোচন

টি-২০ বিশ্বকাপের পঞ্চম আসরের লড়াইয়ের উত্তাপ উঠেছিল বাছাই পর্ব বা প্রথম রাউন্ডেই! ডাচরা আইরিশদের সঙ্গে তাড়া করেছিল অসম্ভব এক লক্ষ্য, মাইবার্গ-বারেসি-ক্রুপাররা তুলেছিলেন ১৩.৫ ওভারেই ১৯০ রান! সেই ডাচরা দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়ে আরেকদফা চমকে দিল, শিকার অবশ্য পুরোনোই, ইংল্যান্ড! চমকে দিল পার্টটাইমার হংকংও। বাংলাদেশে ঘায়েল হলো 'সিক্স-এ-সাইড' ক্রিকেটের 'হোতা'দের কাছে! সেমিফাইনালে ড্যারেন স্যামি ঝড় তুলতে পারেননি আগের ম্যাচের মতো, ডেল স্টেইন পারেননি আফ্রিকানদের চিরন্তন আক্ষেপ নক-আউট ম্যাচ জেতার! এশিয়ার মাটিতে প্রতিপক্ষ তাই দুই এশিয়ান, '০৭ এর পর প্রথম ফাইনাল খেলতে নামা ভারত, টানা দ্বিতীয়বার আর ৫ বারের মধ্যে তিনবারই ফাইনাল খেলতে নামা শ্রীলঙ্কা। তবে ক্রিকেট বিধাতা এবার আর হতাশ করেননি লঙ্কানদের, দুই কিংবদন্তি কুমার সাংগাকারা ও মাহেলা জয়াবর্ধনের বিদায়ী ম্যাচে শ্রীলঙ্কা হারুক, এটা বোধহয় চাননি স্বয়ং তিনিও!

ক্রিকেট কাঁপানো সেই ফাইনাল

ইমতিয়াজ আজাদ

একটা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য কত অন্তহীন অপেক্ষা থাকে! দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বৈরথ তো শুধু ক্রিকেট ম্যাচ নয়, তার চেয়েও তো বেশি কিছু। আর সেটা যদি ফাইনালে হয়, তাহলে তো কথাই নেই! ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ দুই দল মুখোমুখি হয়েছে অনেকবারই। কিন্তু ফাইনালের মঞ্চে সেটা আর হয়নি। কে জানতো, ছোট বিশ্বকাপের প্রথম আসরে এসে সেই অপ্রাপ্তি ঘুচবে! টি-টোয়েন্টির প্রথম বিশ্বকাপ দুই দলকে যে চূড়ান্ত মঞ্চে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে, সেটা কে ভেবেছিল ? পাকিস্তান ভাবলেও ভারত অন্তত সেমিফাইনালের অন্তিম সময় পর্যন্তও সেটা ভাবেনি। প্রথম সেমিফাইনালে পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলা নিউজিল্যান্ডকে পাকিস্তানের সামনে খুঁজেই পাওয়া গেল না। উমর গুল ৪ ওভারে ১৫ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নিয়ে একাই ধসিয়ে দিলেন নিউজিল্যান্ডকে। কিউইদের ইনিংস শেষ হয় ১৪৩ রানে। ইমরান নাজিরের ঝড়ে সেটা সহজেই পেরিয়ে যায় পাকিস্তান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টসে জিতে ব্যাটিং নিলো ভারত। কিন্তু ৭ ওভারের মধ্যে দুই ওপেনারকে হারিয়ে বিপদে পড়ে গেলো তারা। স্কোরবোর্ডে তখন মাত্র ৪১ রান। এরপরেই রুদ্রমূর্তিতে দেখা দিলেন যুবরাজ সিং। রবিন উথাপ্পার সাথে ৩য় উইকেটে ৮৪ রান যোগ করে স্কোর অস্ট্রেলিয়ার নাগালের বাইরে নেওয়া শুরু করলেন। উথাপ্পার বিদায়ের পর ধোনির সাথে আরও ৩০ রান যোগ করে ফিরলেন ৩০ বলে ৭০ রান করা যুবরাজ। তখনো খেলার ১৫ বল বাকি। ধোনির মারকাটারি ব্যাটিংয়ে স্কোর দাঁড়ায় ২০ ওভারে ১৮৮।

শুরু থেকেই ঝড় শুরু করলো অস্ট্রেলিয়া। একটা সময় তাদের জেতার জন্য সমীকরণ দাঁড়াল, ২০ বলে ৩৩ রান। ক্রিজে আছেন মাইকেল ক্লার্ক আর মাইক হাসি। আসল কাজ তো হেইডেন আর সাইমন্ডস মিলে করে দিয়েই গিয়েছেন। এখন তুলির শেষ আঁচড়টা দিতে পারলেই কাজ শেষ। কিন্তু তরী ভেড়াতে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। অসাধারণ এক বলে ক্লার্ককে বোল্ড করলেন হরভজন সিং। মাইক হাসিকে যুবরাজ সিংয়ের হাতে ক্যাচ বানালেন যোগিন্দর শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ১৭৩ রানে। ভারত চলে গেলো ফাইনালে।

গ্রুপপর্বের 'টাইব্রেকার'-এর পরে আবারো ফাইনালে দেখা দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর।

টসে জিতে ব্যাটিং নেন ধোনি। বীরেন্দর শেবাগ আগের ম্যাচ থেকেই কুঁচকির ইনজুরিতে ভুগছিলেন। তার জায়গায় খেলার কথা ছিল দীনেশ কার্তিকের। কিন্তু ম্যাচের শুরুতেই একটা জুয়া খেলে সবাইকে হতভম্ব করে দেন ধোনি। দীনেশ কার্তিকের বদলে গৌতম গম্ভীরের সাথে ওপেন করতে নামেন পাঠান ব্রাদার্সএর বড়জন ইউসুফ পাঠান। তখন সবার মুখে একটাই কথা, "ইউসুফ পাঠান হু?"৮ বলে ১৫ রান করে আউট হয়ে গেলেন ইউসুফ পাঠান। দলীয় ৪০ রানে শোয়েব মালিকের বলে আফ্রিদির হাতে ক্যাচ দেন রবিন উথাপ্পাও। এরপর বাকি সময়টা শুধু "গম্ভীর" শো। তৃতীয় উইকেটে যুবরাজের সাথে যোগ করেন ৬৩ রান। টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান যুবরাজকে এদিন শুরু থেকেই ভীষণ অচেনা লাগছিলো। ফলাফল গম্ভীরের সাথে ৬৩ রানের পার্টনারশিপে তার অবদান মাত্র ১৪। ১৩০ রানে দলকে রেখে যখন বিদায় নেন গৌতম গম্ভীর, ততক্ষণে তিনি যোগ করেছেন ৫৪ বলে ৭৫ রান। শেষদিকে রোহিত শর্মার ১৬ বলে ৩০ রানের একটা ছোট ঝড়ের সুবাদে ভারত পায় ১৫৭ রানের স্কোর।

ওয়ান্ডারার্সের পিচে ১৫৭ রান খুব ছোট কিছু না। আবার খুব বড়ও না। বিশেষ করে বোলারদের জন্য পিচে তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই পিচেও দুর্দান্ত বোলিং এর পসরা সাজিয়ে বসলেন দুই বাঁ-হাতি পেসার রুদ্রপ্রতাপ সিং এবং ইরফান পাঠান। নিজের প্রথম দুই ওভারেই রুদ্র ফেরান মোহাম্মদ হাফিজ আর কামরান আকমলকে। তবে ইমরান নাজির বেধড়ক পিটিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫ ওভারেই রান তুলে ফেললেন ৫০ এর উপরে। রান আউট করে ১৪ বলে ৩৩ রান করে ফেলা ইমরানকে ফেরালেন রবিন উথাপ্পা। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকলো পাকিস্তান। দলীয় ৭৭ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট হিসেবে শূন্য রানে ফিরলেন শহীদ আফ্রিদি। একসময়ে পাকিস্তানের ৪ ওভারে দরকার হয়ে পড়ে ৫৩ রানে। হাতে ৩ উইকেট। অটল পাহাড়ের মতো একপ্রান্ত আগলে আছেন মিসবাহ। কিন্তু তাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ নেই আর। কিন্তু দুই ছক্কায় পরিস্থিতি বদলে দিলেন সোহেল তানভীর। শ্রীশান্তের শেষ বলে বোল্ড হয়ে তানভীর ফেরত গেলে ম্যাচ ঝুলে যায় আবারো। ধোনি তখন নিজের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। ২ ওভারে ১৯ চায় পাকিস্তানের। এই রান করতে মিসবাহ নিজেই যথেষ্ট। একটাই উপায় আছে পাকিস্তানকে আটকানোর। উইকেট ফেলতে হবে। কিন্তু ফেলবেটা কে? ইরফান পাঠান আর শ্রীশান্তের ৪ ওভার শেষ। বাকি আছে রুদ্রপ্রতাপের এক ওভার। রুদ্রপ্রতাপকেই ডাকলেন ধোনি। প্রথম ৪ বলে ৩ রান দেয়া রুদ্রপ্রতাপ ৫ম বলে তুলে নিলেন উমর গুলকে। পাকিস্তানের দরকার ৭ বলে ১৭ রান, ভারতের দরকার এক উইকেট। ম্যাচ অনেকটাই তখন ভারতের নিয়ন্ত্রণে। তারপরের বলটাতেই বাউন্ডারি মেরে দিলেন নতুন ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ আসিফ।

১৯ ওভার শেষে স্কোর তখন ১৪৫/৯। পাকিস্তানের জেতার জন্য লাগবে ৬ বলে ১৩ রান। ভারতের ১ উইকেট।

শেষ ওভারটা ধোনি হরভজনকে করতে বললেন। হরভজন সোজা নিষেধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে ধোনি বল তুলে দিলেন যোগিন্দর শর্মার হাতে। অনভিজ্ঞ যোগিন্দর প্রথম বল করলেন অনেক বাইরে দিয়ে। ওয়াইড। এক রান। ৬ বলে ১২।

পরের বলটাও কিছুটা বাইরে দিয়ে করলেন যোগিন্দর। ওয়াইড ভেবে এবারো ছেড়ে দিলেন মিসবাহ। কিন্তু আম্পায়ারের হাত প্রসারিত হলো না। ৫ বলে ১২। পরের বলটাও বাইরে ছিল অনেক। ছেড়ে দিলে হয়তো ওয়াইড হতো। কিন্তু মিসবাহ আর কোন ঝুঁকিতে গেলেন না। ব্যাকফুটে এসে লং অফ দিয়ে বলটাকে সোজা আছড়ে ফেললেন মাঠের বাইরে।
ছক্কা।
স্কোর ১৫২/৯। পাকিস্তানের দরকার ৪ বলে ৬ রান; একদম হাতের নাগালে। ধোনি খেয়াল করেছিলেন মিসবাহর স্কুপ করার অভ্যাস আছে। তাই তিনি ফাইন লেগ থেকে শ্রীশান্তকে নিয়ে আসলেন ৩০ গজের ভিতরে। যোগিন্দরকেও হয়ত বক হোলেই বল ফেলতে নির্দেশ দিলেন ধোনি।

স্লোয়ার বলটা স্কুপ করলেন মিসবাহ। বল উঠে গেলো আকাশে। ছক্কা?? না চার? টিভি ক্যামেরা আকাশে থাকা বল অনেকক্ষণ ধরে রাখায় দর্শকদের শ্বাসটাও বুঝি আটকে যাচ্ছিলো।

আউট!! মিসবাহ আউট!! পাকিস্তান অলআউট!!

বল শ্রীশান্তের তালুবন্দি। শ্রীশান্ত কোনরকমে ধরে ছুঁড়ে দিয়েই দিলেন দৌড়। মিসবাহ ওদিকে তখন বসে আছেন পরাজিত সৈনিকের মতো। ভারত ৫ রানে জয়ী। প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। যে ভারত প্রথমে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আসতেই চাচ্ছিলো না, তারাই কিনা চ্যাম্পিয়ন। ২০০৭ সালে ক্যারিবিয়ানে ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়ার দুঃখে কিছুটা হলেও বুঝি প্রলেপ পড়লো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতায়।

ধোনির অমরত্বের পথেও যাত্রা শুরু হলো এই ম্যাচ দিয়েই।

আর এই এক ম্যাচে বদলে গেলো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভবিষ্যত!

হতাশার নাম টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ!

রিফাত মাহমুদ

টি–টোয়েন্টি যেন অমোঘ এক রহস্যের নাম বাংলাদেশের কাছে! অথচ সূচনাটা ছিল আশা জাগানিয়াই!

২০০৭
কী আশায় বাঁধি খেলাঘর

ইতিহাসের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচই গড়ে দিয়েছিল ওই আসরে বাংলাদেশের পথযাত্রা। স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে কঠিন এক গ্রুপেই পড়েছিল বাংলাদেশ। ক'দিন আগেই ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সুপার এইটে জায়গা করে নিলেও, টি-টোয়েন্টিতে কাজটা যে সহজ হবে না তা জানাই ছিল। আসল বিশ্বকাপে দুই টেস্ট খেলুড়ে দেশকে হারিয়ে চমক দেখানো বাংলাদেশ 'ছোট বিশ্বকাপ'-এ এসেও মেলে ধরল নিজেদের। প্রথম ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বধ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম ম্যাচ আগেই হেরেছিল ক্যারিবীয়রা। বাংলাদেশকে সুপার এইটের জায়গাটা দেখিয়ে তাই বিদায় নিতে হলো তাদের।

এক ম্যাচ জিতেই সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করে ফেললো আশরাফুলের বাংলাদেশ। উইন্ডিজের সঙ্গে ম্যাচেও বাংলাদেশের আশার ফুল হয়ে ফুটেছিলেন আশরাফুল। ২০ বলে ফিফটি করে টি-টোয়েন্টিতে সে সময়ের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। আফতাব করেছিলেন ৬২, ১৬৫ রানের পাহাড় ডিঙ্গেছিলো বাংলাদেশ! আগের ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ২০০ পেরুনো স্কোর করেছিল ক্যারিবীয়রা। তুলনামূলক কম রানে তাদের আটকে রাখার কৃতিত্বটা সৈয়দ রাসেল আর সাকিব আল হাসানের। গেইলের উইকেট সহ রাসেল ৪ ওভারে দিয়েছিলেন মাত্র দশ রান। সাকিব নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের সাফল্যের শুরু আর শেষটাও হয়েছিল ওই ম্যাচেই! গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের পর সুপার এইটে ব্রেট লির হ্যাটট্রিকে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়া, শ্রীলংকার বিপক্ষে ১৪৭ তাড়া করতে নেমে ৮৩ রানেই অলআউট হওয়া, আর পাকিস্তানের সাথে শেষ ম্যাচে হার!

২০০৯

স্বপ্ন আর হতাশার গল্প

আরেকটি বিশ্বকাপ। এবার ইংল্যান্ডে। ১৯৯৯ সালে যেখান থেকে শুরু বাংলাদেশের। স্কটল্যান্ডের পর পাকিস্থান বধের সেই সুখস্মৃতি তো ছিলই, সঙ্গে ছিল দুই বছর আগের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় পর্বে ওঠার স্মৃতিও। ভারত আর আয়ারল্যান্ডের সাথে আগেরবারের মত 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশ। সুপার এইটে ভারতের সাথে দ্বিতীয় দল হিসেবে বাংলাদেশের ওঠা নিয়ে সন্দেহ ছিলই বা কজনের! এবার ঘটলো উল্টো ঘটনা। ভারতের দেয়া ১৮০ রানের জবাবে বাংলাদেশ করলো ১৫৫। আয়ারল্যান্ডের সাথে পরের ম্যাচে আগে নেমে বাংলাদেশের স্কোর ১৩৭। মাশরাফি নীচের দিকে নেমে করলেন ৩৩, প্রথম ব্রেক-থ্রুও এনে দিলেন। তবে শেষরক্ষা হলো না, দুই ম্যাচ হেরে একটু আগে-ভাগেই তাই তাঁদের উঠতে হল দেশে ফেরার উড়োজাহাজে!

২০১০

সেই চক্রেই বাংলাদেশ!

২০০৯ এ যদি দশ বছর আগের স্মৃতি তাড়া করে ফেরে বাংলাদেশকে, তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টাইগারদের ওপর প্রত্যাশাটা ছিল অভ্রভেদী। ২০১০ এর ওই বিশ্বকাপের আগের বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে প্রথমবারের মত দেশের বাইরে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট আর ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পরের বছরই সেখানেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের মতোই গ্রুপটা এবারও কঠিন। আগের বারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পন। আশরাফুলের ৬৫ রানের ইনিংসটা অবশ্য আশা জাগিয়েছিল, তবে পাকিস্তানের দেয়া ১৭৩ টার্গেটটা আর ছোঁয়া হয়নি। সাকিব-তামিমরা থেমে গিয়েছিলেন ২১ রান দূরে থাকতেই। গ্রুপের অন্য ম্যাচে পাকিস্তান আবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার সমীকরণটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে বাংলাদেশের জন্য। শেষ ম্যাচে তাই শুধু অস্ট্রেলিয়াকে হারালেই চলতো না। রান রেটের হিসেব নিকেশও যোগ হয়েছিল সাথে। হিসেবের বালাইয়ে না গিয়ে অবশ্য হেরেই গিয়েছিল বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়াকে ১৪১-এ বেঁধে ফেলেও, ব্যাটিংয়ে সেই পুরোনো বাংলাদেশের আবির্ভাব। ৮ বল বাকি থাকতেই, ১১৪ রানে অলআউট।আরেকটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আরেকবার হতাশায় ডোবা!

২০১২

এশিয়া কাপও সহায়ক নয়!

তরতাজা এশিয়া কাপের স্মৃতি। ভারত-শ্রীলংকাকে হারিয়ে ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরে বিসর্জন দিতে হয়েছিল কাপ জয়ের স্বপ্নটা। তবুও বাংলাদেশ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আলাদা করেই লেখা থাকবে সেবারের আসরটা। এশিয়া কাপে যাই হোক, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'ব্যর্থতার পর সাফল্য' প্রবাদটা বাংলাদেশের সঙ্গে তা একেবারেই যায় না। বরং বারবারই উল্টো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবারো ঐতিহ্য বজায় রেখেই প্রথম রাউন্ডেই বিদায়। প্রস্তুতি ম্যাচেই অবশ্য কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে বাংলাদেশের দৈন্যটা বোঝা গিয়েছিল। জিম্বাবুয়েকে হারালেও, আয়ারল্যান্ডের কাছে হারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল পাকিস্তান আর নিউজিল্যান্ডকে টপকে 'ডি' গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের সুপার এইটে যাওয়া কতোটা কঠিন হবে। পাকিস্তানের সাথে লড়াই করতে পারলেও, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আবার সেই টি-টোয়েন্টির গরীব-গয়বর বাংলাদেশ। এশিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেও খালি হাতেই ফেরত আসতে হল। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণটা ঠিক বাংলাদেশের সাথে যায় না- এমন ভাবনা ক্রমেই পোক্ত হতে শুরু করলো ক্রিকেট পাগল বাঙালির মনেও।

২০১৪

রহস্যের নাম টি-টোয়েন্টি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৫ম আসরটা এবার বসল বাংলাদেশেই। শ্রীলংকা সিরিজ, আর এশিয়া কাপেরব্যর্থতার জাল থেকে বেরোনো হল না বিশ্বকাপেও। এবার বাছাই পর্ব খেলে অর্জন করতে হলো মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা। প্রথম দুই ম্যাচে, আফগানিস্তান আর নেপালকে হারালেও, শেষ ম্যাচে হংকং এর বিপক্ষে লজ্জার সেই হার! ঘরের মাঠে দুর্গতির শুরু সে থেকেই। গ্রুপ পর্বের কোনো ম্যাচেই ঘুরেদাঁড়ানো হল না বাংলাদেশের। টানা ৪ ম্যাচ হেরে, গ্রুপের তলানীতে থেকেই শেষ হল বাংলাদেশেরবিশ্বকাপ মিশন। চার-ছক্কার বিশ্বকাপে স্বাগতিক দেশকে আর খুঁজে পাওয়া গেল কই? টি-টোয়েন্টিতে হারের বৃত্ত থেকে বের হওয়া গেল না ঘরের মাঠেও।

ধর্মশালায় ক্রিকেটধর্ম

মেহদী হাসান রোমেল

রোমান কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটররা মেতে উঠতেন প্রাণনাশের খেলায়, ক্রিকেট মাঠের খেলাটা সেখানে রক্তপাতহীন। তবে কলোসিয়ামের মতো ক্রিকেট-ভেন্যুর তাৎপর্যও তো কম নয়!

সৌন্দর্য মাত্রই আপেক্ষিক। ব্যক্তির রুচি ভেদে সৌন্দর্যের প্রকাশ। ক্রিকেট মাঠের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। পছন্দের মাঠ বেছে নিতে গিয়ে অনেকেই ধন্দে পড়েন। বেশিরভাগ দর্শক কিন্তু আরামপ্রদ চেয়ার,ঝকঝকে-তকতকে টয়লেট আর ভাল কফি পেলেই খুশি। সঙ্গে বিশাল কার পার্কিং লট,গণপরিবহন সুবিধা আর খেলাবান্ধব পরিবেশ থাকলে পয়সা উসুল । চক্ষুসুখের চাহিদা উসুল করে নেয়াও জরুরী। আর যাই হোক, ক্রিকেট তো দেখারও খেলা ? যেমন ধরুন, গলে বসে জয়াবর্ধনের কাভার ড্রাইভ মজা দেখার একরকম, লর্ডসে সেই একই শট দেখার তৃপ্তিটা আরেকরকম।

বিভাজন গড়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সুযোগ-সুবিধা আর ঐতিহ্যে লর্ডস হয়তো বাকিদের থেকে এগিয়ে, আবার প্রকৃতির কৃপণতায় কিছুটা রিক্তও বটে ! ভারত মহাসাগরের কোলঘেঁষা প্রাকৃতিক নয়নভিরাম গলের মতো সেখানে কোন মধ্যযুগীয় দুর্গের খাঁজ কাটা দেয়ালে শীষ কেটে চলে না প্রশান্তির বাতাস। পছন্দের স্টেডিয়াম বেছে নেয়ার তিনটি সম্ভাব্য অনুমিতি- চোখে মায়াঞ্জন বোলানোর মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন দর্শকবান্ধব মাঠ আর যেখানে একসঙ্গে যেতে পারে গোটা পরিবার। তাহলে কি এমসিজি ? গোধূলীতে তো ওখানকার আকাশে আগুন লেগে যায় ! অসুবিধেও আছে। সেটা মনস্তাত্ত্বিক। এমসিজির সুবিশাল গ্যালারিতে আপনার অস্তিত্ব একটা পিঁপড়ের সমান ! অনেকের আবার এটাই পছন্দ। ক্রিকেটের বিশাল জনসমুদ্রে বাকিদের মতো নিজের অস্তিত্ব পলকা কাঠির মতোই ক্ষুদ্র, এই ভেবেই তাদের প্রশান্তি। যেমন, 'ঈশ্বর' এর সামনে ক্ষুদ্রতাই মানুষের সার্থকতা ! লর্ডস সেরকম নয়। জনসমুদ্রের থেকে ঐতিহ্যের ঋদ্ধতা প্রাপ্তির পিছু 'হোম অব ক্রিকেট' ছুটেছে বেশি। ভিক্টোরিয়া আমলের প্যাভিলিয়ন, শতাব্দী প্রাচীন 'ওয়েদার ভেন' টানবে চুম্বকের মতো। আছে নিয়ম পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন । স্টাফদের ভাবখানা এমন যেন পান থেকে চুন খসলেই চাকুরী খতম !

নিউল্যান্ডসের টেবল মাউন্টেন ভ্রম জাগানিয়া সৌন্দর্য্যের আকর । ওখানে টেস্ট মানেই দর্শকদের পিকনিক ! জীবন নিয়ে এন্তার অভিযোগের ফিরিস্তি রেখে একটু অবসরযাপন। একটু চক্ষুসুখ, টেবিল আকৃতির পাহাড়টিতে সারি সারি মেঘদলের আছড়ে পড়তে দেখার বিহবল রুপ। কিন্তু ক্রিকেট যাদের কাছে কবিতা হয়ে ধরা দেয় না, টেবল পাহাড়ের কারণে বৃষ্টির উৎপাতে ত্যক্ত-বিরক্তও হতে পারেন তারা।

ধর্মশালাতে পাহাড় আর বৃষ্টি দুটোই পাবেন। ভুল। পর্বত আর বৃষ্টি। হিমালয় পর্বতমালার ধৌলাধার রেঞ্জের কথা বলছি। আছে তুষারপাত। গ্যালারিতে আপনার নাকের দখল নেবে পাইন বনের ঘ্রাণ। দিকচক্রবালে তুষারের টুপি পড়া পর্বত আর নীলাকাশ মিলে-মিশে একাকার। যেন, প্রকৃতির নিরাভরণ সৌন্দর্য্য ! কাংড়া জেলার এ শৈলশহরেই হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়াম। এখানেই টি২০ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার লড়াই মাশরাফিদের। এ শহর এখন 'তাঁর', বৌদ্ধমঠের প্রধান লামা যার মুখচ্ছবি এঁকেছিলেন ধ্যানযোগে। দালাইলামা। পাঞ্জাবের তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর ডেভিড ম্যাকলয়েড ১৮৪৮ সালে এই শহরের পত্তন করেন। ম্যাকলয়েড সাহেবের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্র হিসেবেই শহরটির নামকরণ হয় ম্যাকলয়েডগঞ্জ। ১৯০৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পরিত্যক্ত হয় এই নগরী। এখনও ম্যাকলয়েডগঞ্জ টিকে থাকলেও ধর্মশালার উপশহর বলা যায়। পরবর্তীতে চীন কর্তৃক তিব্বত অধিগৃহীত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে চতুর্দশ দালাই লামা তেনজিন গিয়াৎসো তাঁর কিছু অনুগামীসহ গোপনে দেশত্যাগ করে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই ধর্মশালা দালাইলামার শহর।

এখন ক্রিকেটেরও। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪৫৭ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ধর্মশালাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ ধৌলাধার।

তুষারের টুপি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। তারই কোলে প্রাকৃতিক সবুজ গালিচায় হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যাওয়ার পথে ওপরের রাস্তা থেকে স্টেডিয়ামটিকে দেখলে মনে হবে যেন মেরুন রঙের কোনও বাটি, যার নিচটুকু সবুজ। হিমাচল প্রদেশের এ শহর যেমন দালাই লামা বলতে সবাই অজ্ঞান, তেমনই আরও একজন- ইন্দ্রনাগ। ঝড়বৃষ্টির দেবতা ! তিনি চটে গেলে সব কাজ পণ্ড,ধারণা স্থানীয়দের। তাদের বানানো প্রবাদ, পাহাড়ের আবহাওয়া ও মেয়েদের মেজাজ, একই রকম। আগে থেকে কিছু বলা যায়না ! পাহাড়ে এমনিতেই বৃষ্টি আসার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই রোদ তো এই বৃষ্টি। টি২০ বিশ্বকাপে তাই ইন্দ্রনাগের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিশ্চিত ধোনিদের। অন্তত পাকিস্তান ম্যাচে !

মাশরাফিদের জন্য ধর্মশালা যতটা সৌন্দর্যময়, ঠিক ততোটাই ছিটকে পড়ার মায়াবী ফাঁদ! কোয়ালিফাইং রাউন্ডের তিনটি ম্যাচই খেলতে হবে ধর্মশালায়। গ্রুপচ্যাম্পিয়ন হতে পারলে মিলবে চূড়ান্তপর্বের ছাড়পত্র। মার্চের গোড়ায়, যখন এ ম্যাচগুলো ধর্মশালাতে হবে,তখন সেখানকার কন্ডিশন সবকিছু গুবলেট পাকিয়ে দিতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ১৪-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাংড়া উপত্যকার ওপর শহরটি দাঁড়িয়ে থাকায় সুর্য সেখানে আরও কাছে এবং লম্ব আলো দেয়। দিনের বেলায় শীত কম থাকলেও রাতে হাড়কাঁপিয়ে নামে। কন্ডিশন বিচারে মনে হতে পারে, বাংলাদেশের থেকে নেদারল্যান্ডস আর আয়ারল্যান্ডের সুবিধাই বেশি।

তার ওপর মাঠটি পৃথিবীর সবচেয়ে উচুঁতে অবস্থিত আর্ন্তজাতিক স্টেডিয়ামগুলোর একটি। আর তাই শুরুতেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় ভুগে এ শহরে পা রাখতে হবে আপনাকে। মানিয়ে নিতে দুই-তিন লেগে যায়। মাঠের ভেতর তো কথাই নেই, অক্সিজেনের অভাবে অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠবে সবাই। দলগুলোর জন্য এটাই প্রধান ও গুরুতর সমস্যা। সমস্যা আছে আরও একটি। সেটা ক্রিকেটার দর্শক-দুই কুলের জন্যই হবে তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা। ধর্মশালার গ্যালারীতে স্ট্যান্ড নেই। এ কারণে সিটে বসেই দেখা যায় চারপাশ। আপনার চোখের সামনেই সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থানীয় কাংড়া স্থাপত্যের রেড প্যাগোডা প্যাভিলিয়ন।

স্টেডিয়ামটির আসনসংখ্যা মাত্র কুড়ি হাজার। ভারতের অনান্য স্টেডিয়ামগুলোর তুলনায় সংখ্যাটা কিছুই না। তবে ধর্মশালার বাইশ গজ গতির আধার। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির উইকেটে ! প্রয়াত বব উলমার থেকে ডেল স্টেইন, গিলক্রিস্টরা এখানকার উইকেটের ভক্ত। পিচ কিউরেটর সুনীল চৌহান আর তার ১৮ সদস্যের দল দিবানিশি খেটে তৈরি করছেন বিশ্বকাপের উইকেট। চৌহান জানান, উইকেটকে 'স্পোর্টিং' করতে ঘাসের ব্যবহার মহাগুরুত্বপূর্ণ। মোহালির মতো ধর্মশালার পিচেও ব্যবহার করা হয়েছে বারমুডা ঘাস। মাটি এসেছে লুধিয়ানা থেকে, পালমপুরে পরীক্ষার পর তা দিয়ে উইকেট বানানোর ছাড়পত্র দেয়া হয়। কাদা, পলি আর দুই ধরনের বালি (মোটা আর মিহি) ব্যবহার করা হয়েছে সমানুপাতিক হারে। 'সাধারণত বাউন্সি পিচ বানানে ৪০ শতাংশ কাদা ব্যবহার করা হয়। আমরা ৬৪ শতাংশ কাদা ব্যবহার করেছি। পার্থের ওয়াকায় হারটা ৭৫ শতাংশ।'

পছন্দের স্টেডিয়াম নিয়ে 'রোমান্টিসিজম'-এ ভুগে থাকেন অনেক ক্রিকেটারও।কারো পছন্দের মাঠ অ্যাডিলেড ওভাল, কেউ হয়তো বেছে নেবেন কলকাতার নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন। অনেকের পছন্দ আবার বেশ অদ্ভুতুড়ে। কেন্টের সেন্ট লরেন্স মাঠে সীমানার ভেতরে সেই বিখ্যাত 'লাইম ট্রি' মনে পড়ে ? দুইশো বছরেরও বেশি বয়সী গাছটির ২০০৫ সালে এক ঝড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সীমানার ভেতরে থাকায় গাছটির জন্য এ মাঠে খেলার আইন পর্যন্ত বদলাতে হয়েছে। সেই 'লাইম ট্রি' অনেকের কাছেই ঐতিহ্যের ধারক, আবার কারো কাছে বিরক্তির উৎপাদক। কলিন কাউড্রে এ মাঠটি সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছিলে,"এই পৃথিবীতে আমাকে যদি নিজের শেষ কর্মটি সম্পাদনের কথা বলা হয়,তাহলে আমি সুর্যালোকিত সেন্ট লরেন্সের উইকেটে যেতে চাই আরও একবার। প্যাভিলিয়ন থেকে ভেসে আসবে মৃদুমন্দ খোশগল্পের আওয়াজ, সঙ্গে দর্শকদের হল্লা। আমি তখন অফস্ট্যাম্পের কিছুটা বাইরে একটা হাফভলিকে আলতো ড্রাইভে কাভার অঞ্চল দিয়ে নিজের সেই পুরোনো দিনগুলোর মতো ওই গাছটায় লাগাতে চাই, যেন বাউন্ডারি হয়।" সেন্ট লরেন্সের মতো ধর্মশালাও হয়তো একদিন জায়গা করে নেবে কোন কিংবদন্তির আত্ন-কথায়। স্টেডিয়ামটির দৃপ্ত পথচলা শুরু হয়ে গেছে, ব্যাপারটা তাই স্রেফ সময়ের ব্যাপার !

ছবি কথা কয়

তিনিই প্রথম, তিনিই অভাগা

প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, প্রথম ম্যাচ। টি-টোয়েন্টিতে প্রথম সেঞ্চুরি! ক্রিস গেইলের নাম বসলো চার্লস ব্যানারম্যান, ডেনিস অ্যামিসদের পাশে! ইতিহাসের প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিলেন ব্যানারম্যান, দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অ্যামিস। গেইলের সেঞ্চুরির ম্যাচটা ছিল ২০তম টি-টোয়েন্টি। তবে গেইল বনে গেলেন আরও এক প্রথম, টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করেও পরাজিত! ২০৫ রান করেও যে হেরে বসলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

শেষ হইয়াও হইলো কি শেষ

চির-প্রতিদ্বন্দ্বীদের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ম্যাচ হলো টাই। তবে ম্যাচ শেষ হলো না! ক্রিকেটে নেমে এলো ফুটবলের মতো 'টাই-ব্রেকার'। পোশাকি নাম 'বোল-আউট'। ব্যাটসম্যান থাকবে না, বল করে ভাঙ্গতে হবে স্ট্যাম্প। ভারতীয়রা প্রথম তিন বলই লাগালেন স্ট্যাম্পে, পাকিস্তানিদের কেউই পারলেন না! পরে জানা গেল, পাকিস্তানিরা নাকি নিশ্চিতই ছিলেন না এমন কোনো নিয়মের ব্যাপারে! টি-টোয়েন্টি এটি অবশ্য দ্বিতীয় বোল-আউট এর ঘটনা। প্রথম বোল-আউটে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ডের কাছে। বিশ্বকাপে ভারত পাকিস্তান ম্যাচের পর বল-আউট টিকেছে মাত্র আরেক ম্যাচ।

তিনে তিন

একটা ডট বল যেখানে 'স্বর্ণ'তুল্য,ব্রেট লি সেখানে পরপর তিন বলে পেলেন উইকেট! সাকিব আল হাসান, মাশরাফি মুর্তজা, অলক কাপালি- ইতিহাসের প্রথম টি-টোয়েন্টি হ্যাটট্রিকে লেখা থাকলো বাংলাদেশের নামও। হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে ব্রেট লি যেন স্বগর্বে ঘোষণা করছিলেন বোলারদের চিরন্তন বার্তাই!

ছয় নম্বর ছয়

বলটা গিয়েছিল ওয়াইড লং অন দিয়ে উড়ে। উড়েছিলেন তো যুবরাজ সিংও! সঙ্গে উড়তে হয়েছিলো অভাগা স্টুয়ার্ট ব্রডকেও। এক ওভারেই এমন ছয়বার উড়েছিলেন যুবরাজ, হার্শেল গিবসের পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রথম গড়েছিলেন ছয় বলে ছয় ছয়ের কীর্তি! সে ম্যাচে ১২ বলে ছোঁয়া যুবরাজের ফিফটিটাই এখনও টি-টোয়েন্টির দ্রুততম হয়ে আছে।

লর্ডসে কমলা বিস্ময়!

স্টুয়ার্ট ব্রডের হতাশা ছাপিয়ে ঠিকরে পড়ছে রায়ান টেন ডেসকাটের উচ্ছ্বাস! লর্ডসে ইংলিশদের এক সমুদ্র হতাশায় ডুবিয়ে সেদিন উৎসবে মেতেছিল ডাচরা। ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতেই ঘটেছিল অঘটন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহযোগী কোনো দেশের জয়ের ঘটনাও ছিল এই প্রথম!

দিল-স্কুপ

টি-টোয়েন্টি মানেই উদ্ভাবনী শটের মেলা! তবে পেটেন্ট করা শট থাকে কজনের! তিলকারত্নে দিলশানের আছে কিন্তু! তাঁর এই বিশেষ স্কুপটার নামই তো পরে হয়ে গেছে দিল-স্কুপ!

হাই-ফাইভ

টি-টোয়েন্টির ইনিংসের শেষ ওভারটা যদি মেডেন হয়, কেমন লাগে বলুন? আর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় উইকেট? একটি দুটি নয়, পাঁচটি! অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মোহাম্মদ আমিরের করা ওভারে ঘটেছিল এমন অদ্ভুতুড়ে কান্ড! আমির নিয়েছিলেন তিন উইকেট, রান-আউট ছিল দুইটি। তবে আমীরের এমন কীর্তিটাও কাজে দেয়নি পাকিস্তানের, তার আগেই যে তাদেরকে হারানোর মতো রান তুলে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া!

হাসিতে পাকিস্তানের কান্না

২ ওভার, ৩৪ রান। হাতে ৩ উইকেট। মাইক হাসি টি-টোয়েন্টির ইতিহাসেরই বোধহয় সবচেয়ে কার্যকরী ইনিংসগুলোর একটি খেললেন এ পরিস্থিতিতে! মোহাম্মদ আমিরের করা ১৯তম ওভারে এলো ১৬ রান, হাসির ব্যাট থেকেই ১৪। শেষ ওভারে দরকার ১৮, বোলার সাঈদ আজমল। মিচেল জনসন একটা সিঙ্গেল নিয়ে হাসিকে স্ট্রাইক দিলেন। হাসি এরপর যা করলেন, দুঃস্বপ্নে এখনও তা তাড়া করে বেড়ানোর কথা আজমলকে! ৬, ৬, ৪, ৬, এক বল বাকী থাকতেই ম্যাচ শেষ। টানা তিন ফাইনালে ওঠা থেকে ছিটকে গেল পাকিস্তান, প্রথমবারের মতো ফাইনালে গেল অস্ট্রেলিয়া! আর মাইক হাসি বুনো উল্লাসটা পেল এক অন্যরকম মাত্রা!

জনকের স্বীকৃতি!

ক্রিকেট খেলাটা ধরাধামে এসেছে তাদের হাত ধরেই! অথচ ইংল্যান্ডের ট্রফি শোকেসটা হাহাকারই করেছে এতদিন! অবশেষে পল কলিংউডের হাতে উঠলো একটা ট্রফি! অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ক্যারিবীয়তে ইংলিশরা মাতলো অন্যরকম এক উৎসবে, যাঁর মূল কুশীলবটা ছিলেন এখনকার ইংলিশদলে ব্রাত্য সেই 'দক্ষিণ আফ্রিকান' কেভিন পিটারসেন!

আউট বাই লাক!

থ্রোটা হাতে জমাতে পারলেন না রস টেলর। বেঁচে গেলেন লাহিরু থিরিমান্নে! নাহ্, টেলরের হাত গলে যে বলটা লেগেছিল স্ট্যাম্পে, টেলর শুধু হাত দিয়ে স্ট্যাম্প ভেঙ্গে দেয়ার আগেই! ম্যাচ টাই! তবে ভাগ্যের জোরে পাওয়া আউটটা কাজে লাগাতে পারলো না নিউজিল্যান্ড, সুপার ওভারে হেরে বসলো ঠিকই!

হংকং রুপকথা!

বিশ্বকাপের সুপার টেনে ওঠা হয়নি, তাতে কী! ২০১৪ সালে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যে অনেকদিন বলে বেড়ানোর মতো এক গল্প দিয়েছে হংকংকে! চার শুন্যতে বাংলাদেশের স্কোরটা আটকে ছিল ১০৮ রানেই, দুই উইকেট আর দুই বল বাকী থাকতে হংকং পেরিয়ে গিয়েছিল তা।

গ্যাংনাম স্টাইল!

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া, ফাইনালে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা- ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপ্নযাত্রায় বাধা হতে পারেনি কেউ! প্রায় ৩৩ বছর পর বিশ্বকাপ জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হোক তা ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতর সংস্করণে! তবে সব ছাপিয়ে বোধহয় বাধা হয়ে রইলো একটা ছবি, দলবেঁধে ক্যারিবীয়দের গ্যাংনাম স্টাইলের নাচ!

ফ্লাই নেদারল্যান্ডস ফ্লাই!

২০ ওভারের জন্যও লক্ষ্যটা বেশ কঠিন। সেখানে নেদারল্যান্ডসকে পরের রাউন্ডে যেতে ১৯০ রান করতে হতো ১৪.২ ওভারে! বোরেন, মাইবার্গ, বারেসি, কুপাররা অসাধ্য সাধন করলেন, তাও তিনবল বাকী থাকতেই! সিলেটে উড়লো ডাচরা, আর বিশ্বকাপ থেকে উড়াল দিতে হলো আইরিশদের!

নতুন আসর, পুরোনো দক্ষিণ আফ্রিকা!

নক-আউট পর্ব আর দক্ষিণ আফ্রিকা, দুইয়ের বিষাদযুগলের যেন শেষ নেই! আরেকটি সেমিফাইনাল; ভিলিয়ার্সদের আরেকটি হতাশা! এবার ভারতের কাছে হেরে ফাইনালের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হলো প্রোটিয়াদের!

বিদায় রাজসিক!

শ্রীলঙ্কা ফাইনাল খেলে। শ্রীলঙ্কা ফাইনাল হারে। বিশ্বকাপ, তা হোক ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি, এ শতাব্দীতে যেন সাধারণ এক ঘটনা। সে সাধারণ ঘটনাটাই অবশেষে বদলে গেল, দুই অসাধারণের বিদায়ী ম্যাচে! ভারতের সঙ্গে ফাইনাল দিয়েই টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছিলেন শ্রীলঙ্কার দুই কিংবদন্তি, যাওয়ার আগে ট্রফিতে ছুঁয়ে গেছেন হাত!

অস্ট্রেলিয়ার যে ছবিটা নেই

সাইফুল্লাহ্ বিন আনোয়ার

ক্রিকেট সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল তারা কতদিন! তবে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ক্রিকেট রাজার মুকুটেই ওঠেনি একটা পালক!

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিটা ছিল একটু অন্যরকম। দুইটা অংশ। একটা চাপা ইনার এর ওপর আরেকটা সুয়েটার এর মতো অংশ। অ্যাডিডাসের বানানো। যতদিন অ্যাডিডাস ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ছিল, জার্সির আদলটাও ছিল একই। অ্যাডিডাস গেল, এলো অ্যাসিকস। জার্সি বদলে গেল। তবে ভিন্নতা থাকলো ঠিকই! চিরায়ত গোল্ড ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া পরলো সবুজাভ রঙ। জার্সি বদলেছে। অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভাগ্য বদলায়নি। ওয়ানডে বিশ্বকাপের সফলতম দলের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই যেন এক রহস্যের নাম!

২০০৭ সালে সেই যে জিম্বাবুয়ের কাছে হেরে শুরু। যুবরাজ সিংয়ের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায়। সে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে রিকি পন্টিংয়ের একটা ছবি আছে। হাস্যোজ্জ্বল ছবি। সামনে অনেকগুলো স্মারক ট্রফি। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, অ্যাশেজের ট্রফি, ওয়ানডেতে এক নম্বর হওয়ার স্মারক, টেস্টের শীর্ষস্থানের ওই গদাটা। একটা ট্রফি নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি। থাকার সুযোগ ছিলও না! তখনও যে টি-টোয়েন্টির বিশ্বকাপ ধরাধামে অবতীর্ণই হয়নি!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এসেছে। রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্কের পর এ ফরম্যাটে জর্জ বেইলির ওপর ভার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তবে ছবির শুন্যস্থানটা পূরণ হয়নি! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যে অধরাই থেকে গেছে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সফল এই দলটার!

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় আসর তো অস্ট্রেলিয়াকে উপহার দিল রীতিমতো বিভীষিকা! গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায়, অস্ট্রেলিয়ার কাছে তো বিভীষিকাই! অ্যাশেজ-প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাটি থেকে বয়ে আনা সেই বিভীষিকার বাতাস ক্যারিবীয় সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে চাইলো অজিরা। প্রথমবারের মতো ফাইনালেও গেল! তাও আবার মাইক হাসির অতিমানবীয় এক ইনিংসে ভর করে। তবে হাতছোঁয়া দূরত্ব থেকে ফিরে আসতে হলো! ক্রিকেট বিধাতা যে সেবার ইংল্যান্ডের চিরকালীন আক্ষেপটা ঘোচাবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন!

ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এল লঙ্কার দ্বীপরাষ্ট্রে। টানা চার ম্যাচ জিতে অস্ট্রেলিয়া যেন জানান দিল, এবার কিছু একটা হবেই! সুপার এইটের শেষ ম্যাচটা পাকিস্তানের সঙ্গে হেরে একটু যেন ঘাটতি পড়লো আত্মবিশ্বাসে! তাতে কী, সেমিফাইনালে তো ওঠা হয়েই গেছে! অজিরা কি তখন জানতো, কী নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন গেইল, ব্রাভো, পোলার্ডদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ! শেন ওয়াটসন টুর্নামেন্টসেরা হলেন, অস্ট্রেলিয়ার আক্ষেপ তো আর ঘুচলো না!

শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশ। চিত্রটা শুধু রঙ-ই হারালো, কাঠামো বদলালো না। সুপার টেন-এ, আদতে অস্ট্রেলিয়ার জন্য যা ছিল গ্রুপপর্বই, টানা চার ম্যাচ হেরে বিদায়টা নিশ্চিত করলো অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচে সান্ত্বনার জয় বাংলাদেশের সঙ্গে! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুধু উপহাসই করলো অস্ট্রেলিয়াকে, আরেকবার!

পন্টিং, ক্লার্ক বা বেইলি যা পারেননি, তাই আবার করেছেন অ্যালেক্স ব্যাকওয়েল, জডি ফিল্ডস, মেগ ল্যানিংরা। প্রথম আসর বাদ দিলে 'উইমেন্স' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া! চাইলে নতুন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ প্রেরণা নিতে পারেন অজি-লেডিদের কাছ থেকেও!

সাম্প্রতিক ফর্ম অবশ্য প্রেরণাদায়ক নয় খুব একটা। বিশ্বকাপের আগ দিয়ে দেশের মাটিতেই ভারতের কাছে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে স্মিথের দল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সিরিজেও হেরেছে প্রথম ম্যাচ। ফরম্যাটের নাম টি-টোয়েন্টি, হতে পারে যেখানে অনেককিছুই বলেই হয়তো অস্ট্রেলিয়া বাতিলের খাতায় পড়ছে না!

এমনিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের অনেক নিয়ম মেনে চলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও! চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড খেলে চলে সেমিফাইনাল। দক্ষিণ আফ্রিকা বিদায় নেয় নক-আউট পর্ব থেকেই! শুধু ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই দাপটটা নেই অস্ট্রেলিয়ার!

স্টিভ স্মিথ কি পারবেন, পন্টিং-ক্লার্ক-বেইলিদের রেখে যাওয়া সেই ফাঁকা ফ্রেমে একটা সোনালী ছবি বসাতে?